সত্য - কাকাবাবুর কীর্তিকলাপ

কাকাবাবুর চোখে জল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

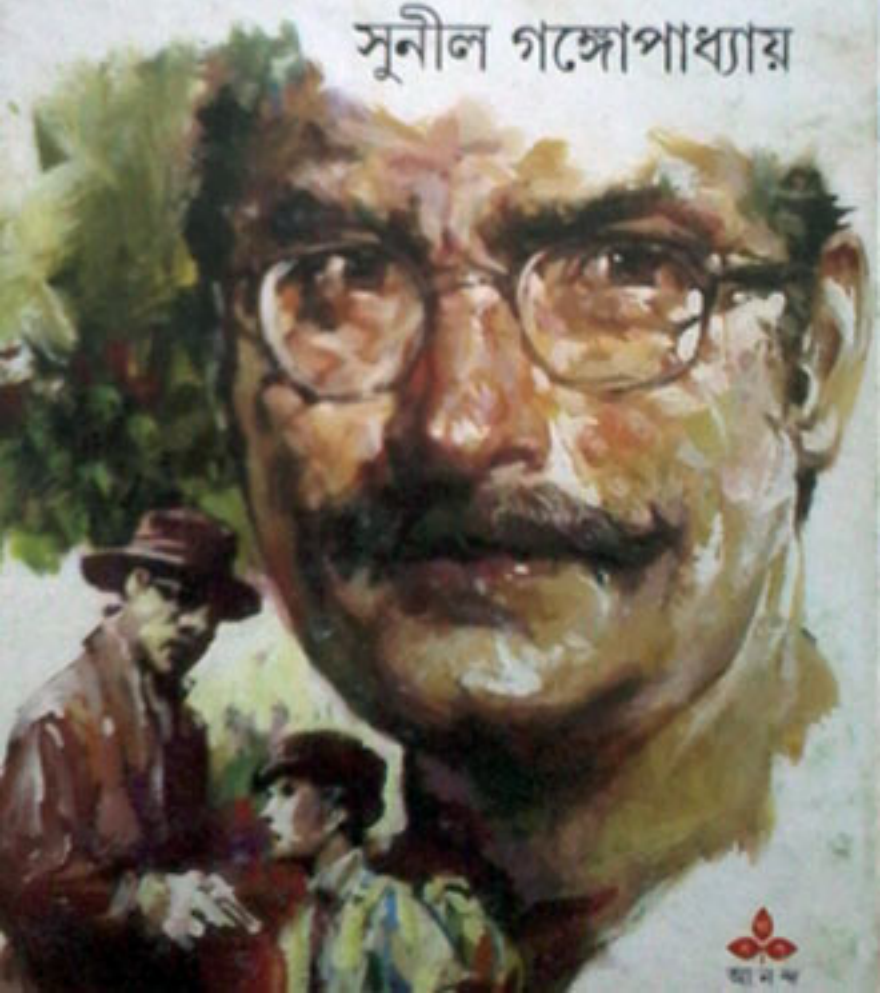

আনন্দ

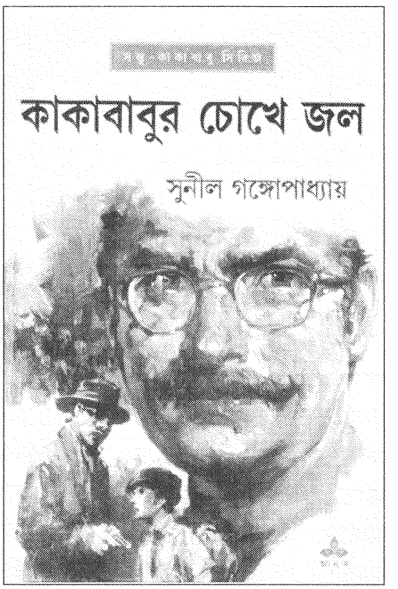

কাকাবাবুর চোখে জল

হঠাৎ সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় একটা দারুণ ভাল খবর পাওয়া গেল। আজকাল সত্যি সত্যি আনন্দের খবর তো পাওয়াই যায় না! খবরের কাগজে শুধু মারামারি, এ দলে ও দলে ঝগড়া। এই তো কালই শিয়ালদা স্টেশনে যাত্রীরা কী কারণে যেন খেপে গিয়ে অফিসঘর আর জানলা-দরজা ভাঙচুর করল। আজ সকালেই বাবা বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়ে গোড়ালির হাড় মচকে ফেললেন, এখন সেই পায়ে মস্ত বড় ব্যান্ডেজ। দুপুরবেলা বুলবুলিপিসির ভাতের থালায় হঠাৎ থপাস করে একটা টিকটিকি এসে পড়ল উপর থেকে। তা দেখে বুলবুলিপিসি আঁতকে উঠে এমন চেঁচিয়ে উঠলেন, যেন বাড়িতে ভূতেরা এসে নাচ শুরু করেছে!

বুলবুলিপিসি থাকেন ত্রিপুরায়। বেড়াতে এসেছেন তিন-চারদিনের জন্য। তাঁরই ভাতের থালায় পড়ল টিকটিকি? অথচ এ বাড়িতে আগে কখনও কারও ভাতের থালায় টিকটিকি পড়েনি। কোনও টিকটিকি ধারেকাছেই আসে না।

মেয়েরা সকলে টিকটিকি ভয় পায়। মা, ছোড়দি আর বুলবুলিপিসি ভাতের থালা ছেড়ে দৌড়ে পালালেন। বুলবুলপিসি বমি করতে লাগলেন বাথরুমে গিয়ে।

সন্তু টিকটিকি দেখলে ভয়ও পায় না, ঘেন্নাও করে না। টিকটিকি অতি নিরীহ প্রাণী। সব বাড়িতেই থাকে কিন্তু মানুষকে কামড়ায় না কখনও। বরং দেওয়ালে-দেওয়ালে ঘুরে পোকামাকড় খেয়ে মানুষের উপকারই করে। সন্তু মাঝে মাঝে টিকটিকির দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে ভাবে, ঘরের খাড়া দেওয়ালে কিংবা ছাদের সিলিং-এ ওরা কী করে লেপটে থাকে? ওরা কি মাধ্যাকর্ষণ মানে না?

সেই টিকটিকিটা ভাতের থালার উপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়েই আছে, নড়ছে-চড়ছে না। মরেনি, তা অবশ্য বোঝা যায়।

সন্তু থালাটার কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বলল, "এই, যাঃ! যা।"

সেটা নড়ল না। মুখ ঘুরিয়ে সন্তুর দিকে তাকাল। কেমন যেন ফ্যালফেলে অসহায় দৃষ্টি।

সন্তু একটা চামচে নিয়ে ওর গায়ে না ছুঁইয়ে থালায় লাগিয়ে টংটং শব্দ করল। এবার সে একটু এগোবার চেষ্টা করল। তখন বোঝা গেল, ওর একটা পা ভাঙা। একদিকে কাত হয়ে পড়েছে।

উপর থেকে পড়ে গিয়ে খোঁড়া হয়ে গেল? কিংবা আগেই একটা পা ভাঙা ছিল। তাই পড়ে গিয়েছে! সন্তু আগে কখনও খোঁড়া টিকটিকি দেখেনি। আজ সকালেই বাবার পা মচকাল আর একটা টিকটিকিও খোঁড়া হল, এ যেন কীরকম আজব ব্যাপার।

সন্তু থালাসুদ্ধ টিকটিকিটাকে তুলে নিয়ে চলে এল বারান্দায়। টিকটিকিটা অমনই এক লাফে চলে এল রেলিং-এ। তারপর ডিগবাজি খেয়ে মিলিয়ে গেল যেন কোথায়।

যাক, বেঁচে তো গিয়েছে! কিন্তু এর পর কেউ আর খেতে বসলেন না।

বিকেলবেলা কথা নেই, বার্তা নেই, আচমকা ঝড় উঠল। সারাদিন আকাশ দেখে কিছুই বোঝা যায়নি। প্রথমে কয়েকবার গুড়গুড় শব্দ, তারপরই চড়াত করে একটা লম্বা বিদ্যুৎ আর একটু পরেই দশখানা কামানের আওয়াজে বজ্রপাত।

গরমকালে ঝড়-বৃষ্টি সকলেরই ভাল লাগে। সন্তু খুবই ভালবাসে বৃষ্টি দেখতে, ছাদে গিয়ে বৃষ্টিতে খানিকটা ভিজেও নেয়। বুলবুলিপিসিও বেশ বৃষ্টি পছন্দ করেন, ছাদে এসে ভিজতে লাগলেন সন্তুর সঙ্গে। মা ছাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "এই বুলবুলি, তুইও দেখছি মেতে উঠেছিস সন্তুর সঙ্গে। শিগগির চলে আয়, এই বৃষ্টিতে ভিজলেই জ্বর হবে!"

তা শুনে বুলবুলিপিসি একপাক নেচে নিয়ে গান ধরলেন, "ওরে ঝড় নেমে আয়। আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে..."

এই পর্যন্ত বেশ ভালই। তারপরই একটা খারাপ ঘটনা ঘটল।

কাকাবাবু সকাল থেকেই বাড়িতে নেই। তাঁর বন্ধু নরেন্দ্র ভার্মার সঙ্গে দেখা

করতে গিয়েছেন এক হোটেলে। তারপর দু'জনে যাবেন ডায়মন্ড হারবার, কখন ফিরবেন ঠিক নেই।

সারাদিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা ছিল না বলে কাকাবাবুর ঘরের জানলাটানলা ঠিকমতো বন্ধ করা হয়নি। একটা জানলার আবার ছিটকিনি আলগা। ঝড়ের দাপটে দুটো জানলা দড়াম করে খুলে গিয়ে এলোমেলো করে দিয়েছে সব কাগজপত্র। কেউ আগে খেয়াল করেনি। বাড়ির কাজের লোক রঘু একসময় সে ঘরে ঢুকে, "ও মা গো, কী সব্বোনাশ হয়েছে গো!" বলে কেঁদে উঠেছে। বৃষ্টির ছাঁট এসে বেশ কিছু বই-কাগজ ভিজিয়ে দিয়েছে।

টেবিলের উপর ছড়ানো ছিল দুটো ম্যাপ। সে দুটোই ভিজেছে বেশি। এই ম্যাপ কাকাবাবুর খুব প্রিয়। তিনি দেশ-বিদেশের বহু ম্যাপ সংগ্রহ করেন। সেই সব ম্যাপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তিনি ভ্রমণের আনন্দ পান। অনেক ম্যাপ তিনি কিনে আনান বিদেশ থেকে।

সন্তু ছুটে এসে দেখল, অনেক কাগজ আর বইয়ে জল লেগেছে তো বটেই, ম্যাপদুটোই ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গিয়েছে। পুরনো ম্যাপ, ছিঁড়ে যাচ্ছে তুলতে গেলেই।

বৃষ্টি থেমে গেল। তবু সকলের মুখ থমথমে। কাকাবাবু ফিরে এসে তাঁর প্রিয় কাগজপত্র ও ম্যাপের অবস্থা দেখে চটে লাল হবেনই। তখন কী উত্তর দেওয়া হবে?

সবচেয়ে মুশকিল এই, কাকাবাবু খুব রেগে গেলেও কাউকে তো বকাবকি করবেন না। কিছু বলবেনই না, শুধু উৎকট গম্ভীর হয়ে যাবেন। তাঁর সেই গাম্ভীর্যকেই সকলে ভয় পায়।

সারাদিনটাই তো কাটল এইরকম গন্ডগোলে। তারপর এল সুসংবাদ।

সন্ধেবেলা লুচি আর মোহনভোগ খাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টি-বাদলার জন্য বুলবুলিপিসি বললেন, "মুড়ি-বেগুনি আর পাঁপড়ভাজা খাওয়া হবে। ত্রিপুরায় ভাল বেগুন পাওয়া যায় না, কলকাতার বেগুনের স্বাদ চমৎকার।"

বৃষ্টির তেজ আস্তে আস্তে কমে যাওয়ার পর একসময় একেবারেই থেমে গেল। উনুনে বেগুনি ভাজা শুরু হয়েছে। মা পেঁয়াজকুচি, লঙ্কাকুচি আর সর্ষের তেল দিয়ে মুড়ি মাখছেন, এই সময় বেজে উঠল টেলিফোন।

সেই আওয়াজ শুনে চমকে উঠল সন্তু। কারণ, কাল থেকে টেলিফোনটা একেবারে বোবা হয়ে ছিল। টেলিফোন অফিসে খবর দিয়েও কোনও কাজ হয়নি। কোনও মিস্তিরি আসেনি। এখন সেটা নিজে নিজে ভাল হয়ে গেল?

সন্তু খুব ব্যগ্রভাবে রিসিভারটা তুলে বলল, ''হ্যালো, হ্যালো...''

ওদিক থেকে শোনা গেল রিনির গলা।

রিনি ধমক দিয়ে বলল, ''অ্যাই সন্তু, তোদের ফোনটা এত এনগেজ্‌ড থাকে কেন রে? কার সঙ্গে এত গল্প করিস? সকাল থেকে তিনবার চেষ্টা করছি...''

সন্তু বলল, ''কী করব, ইংল্যান্ডের রানি বারবার ফোন করে কাকাবাবুকে খুঁজছেন। এদিকে কাকাবাবু কোথায় গিয়েছেন জানি না। রানির ফোন মানে জানিস তো, প্রথমে একজন সেক্রেটারি, তারপর আর-একজন, তারপর রানি নিজে...''

রিনি বলল, ''ভ্যাট! তুই বুঝি জোজো সাজবার চেষ্টা করছিস? তুই মোটেই জোজোর মতো পারবি না। ইংল্যান্ডের রানি কেন কাকাবাবুকে খুঁজবেন, কাকাবাবু কি বোম্বাগড়ের রাজা?

''শোন, রিনি...''

''তুই আগে আমার কথাটা শোন। এখনই টিভিটা খোল। দিল্লি দূরদর্শন চ্যানেল।''

''কেন, এখন টিভি দেখতে যাব কেন? বেগুনি ভাজা হচ্ছে...''

''বেগুনি? বেগুনি খেতে খেতে বুঝি টিভি দেখা যায় না? শিগগির যা, আমার বেশি কথা বলার সময় নেই। বাড়িসুদ্ধ সকলকে দেখতে বল।''

রিনি রেখে দেওয়ার পর সন্তু ভাবল, হঠাৎ এখন টিভি দেখতে হবে কেন? এই সময় তো খবরটবর হয়। সন্তুর অত খবর শোনার আগ্রহ নেই। কিন্তু রিনি যখন বলেছে, তখন তা অগ্রাহ্য করা মুশকিল। ও নিশ্চয়ই একটু পরে আবার ফোন করে চেক করবে।

বুলবুলিপিসি মায়ের পাশে বসে গল্প করছেন। সন্তু জিজ্ঞেস করল, ''পিসি, তুমি টিভি দেখবে?''

বুলবুলিপিসি লালচে রঙের ঠোঁট উলটে বললেন, ''টিভি? আমার দু'চোখের বিষ। সব সময় খালি বকবক। কলকাতায় এসেছি কি টিভি দেখতে?''

সন্তু দৌড়ে দোতলায় উঠে গেল।

দোতলায় বড় ঘরটাই কাকাবাবুর। অন্য দিকের ঘরটা ছিল ছোড়দির। তার বিয়ের পর ঘরটা প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। সন্তু থাকে ছাদের ঘরের নিজস্ব রাজ্যে। দোতলায় দুটো ঘরের মাঝখানে অনেকটা চওড়া জায়গায়

কয়েকটা চেয়ার পাতা। এখানে মাঝে মাঝে বাড়ির লোকের আড্ডা বসে। এখানেই রয়েছে একটা টিভি, আর-একটা টিভি একতলায়, বাবা-মায়ের ঘরে। কাকাবাবু নিজের ঘরে টিভি রাখেন না। শুধু ক্রিকেট দেখার জন্য বাইরে এসে বসেন। দোতলাতেও একটা টেলিফোন রিসিভার আছে। সন্তু এসে টিভি খুলতে না-খুলতেই আবার বেজে উঠল ফোন।

এবারও রিনি। সে বলল, "উপরে উঠেছিস? দেখেছিস টিভি?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি তো, দিল্লি থেকে খবর হচ্ছে হিন্দিতে। ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প হয়েছে আর হংকং-এ হাজার হাজার মুরগি মরে যাচ্ছে! এসব খবর দেখতেই হবে কেন?"

রিনি বলল, "চুপ করে দেখে যা। একদম ছটফট করবি না। এই খবর শেষ হওয়ার পরেই দেখবি একটা দারুণ, দারুণ খবর!"

হিন্দি খবর চলল দশ মিনিট। তাতে নতুনত্ব কিছুই নেই। মাঝে মাঝে নেতাদের মুখ, তাঁরা কী বলছেন বোঝাই যায় না। রোজ যেন একই রকম। এরপর শুরু হল বিজ্ঞাপন। একবার বিস্কুট, তারপর বাড়ির রং, তারপর মোটরসাইকেল। তারপর শব্দ একেবারে থেমে গেল। শুধু পরপর ছবি। হাতে আঁকা। আঁকাবাঁকা রাস্তার পাশে ছোট ছোট বাড়ি, আকাশে চিল আর ঘুড়ি উড়ছে। নদীর উপরে দুটো নৌকো, ছাতা মাথায় একটা মোটা লোক, কুঁজো হয়ে হাঁটছেন মহাত্মা গাঁধী, গোরুর দুধ খাচ্ছে একটা বাছুর, এইরকম। দেখলেই বোঝা যায়, কমবয়সি ছেলেমেয়েদের আঁকা। এইসব ছবি দেখে কী হবে? রিনি যে বলল, একটা কিছু দারুণ খবর আছে! সেটা কি আরও পরে?

ছবিগুলো দেখাতে দেখাতে ক্যামেরা একটা ছবির উপর থেমে গেল। সেটা একটা বাঘের ছবি। বাঘটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা গাছে ওঠার চেষ্টা করছে। একটু পরে সেই ছবিটার পাশে এসে দাঁড়াল কমলা রঙের সালোয়ার-কামিজ পরা একটি মেয়ে। হাতে মাইক্রোফোন। সে ইংরেজিতে বলল, "এতক্ষণ আপনারা খুদে শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখছিলেন। সাত থেকে দশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এই ছবি এঁকেছে। সারা ভারতের এই বয়সি ছেলেমেয়েদের ছবির প্রতিযোগিতা এই প্রথম। মুম্বই, দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, চণ্ডীগড়, গুয়াহাটি, ভুবনেশ্বর, কানপুর এই সব শহরে হয়েছে প্রথম প্রতিযোগিতা। তারপর প্রত্যেক শহর থেকে তিনটি করে ছবি এসেছে দিল্লিতে। মকবুল ফিদা হুসেন, সতীশ গুজরাল আর যোগেন চৌধুরী, এই

তিন বিখ্যাত শিল্পী বিচার করেছেন ছোটদের আঁকা এই ছবিগুলোর। দু'দিন ধরে আলাপ-আলোচনার পর...।

এই পর্যন্ত শুনে সন্তু ভাবল, রিনি তার সঙ্গে নিশ্চয়ই মজা করেছে। এ আর এমন কী শোনার মতো খবর!

সে টিভিটা বন্ধ করতে যাচ্ছে, তখনই সেই মেয়েটি বলল, ''বিচারকদের মতে সবচেয়ে ভাল হয়েছে এই বাঘের ছবিটি। এই ছবিটি এঁকে সারা ভারতের খুদে শিল্পীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে কলকাতার নীলধ্বজ চক্রবর্তী, বয়স আট বছর চার মাস...''

সন্তুর হাতটা থেমে গেল। কলকাতার একটা ছেলে ফার্স্ট হয়েছে? বাঃ, সেটা তো ভালই খবর। কিন্তু রিনি আগে থেকে জানল কী করে? রিনির চেনা কেউ নাকি?

সালোয়ার-কামিজ পরা মেয়েটি বলল, ''আসুন, এবার আপনাদের সঙ্গে লিট্‌ল চ্যাম্পিয়ন নীলধ্বজ চক্রবর্তীর পরিচয় করিয়ে দিই। সে দারুণ স্মার্ট ছেলে, চটপট সব কথার উত্তর দিতে পারে।''

এবারে দারুণ চমকে গেল সন্তু। এ যে বিল্টু! রিনির ছোট ভাই। তার ভাল নাম যে নীলধ্বজ, তা সন্তু জানত না। আমাদের বিল্টু সারা ভারতের মধ্যে ছবি আঁকায় ফার্স্ট হয়েছে, এ তো সত্যিই খুব ভাল খবর! বিল্টুটা দারুণ দুষ্টু আর গুন্ডা স্বভাবের। সে আবার ছবি আঁকতেও পারে?

সন্তু চেঁচিয়ে বলল, ''মা, বুলবুলিপিসি, শিগগির এসো, টিভি দেখবে এসো...''

এই সময় সিঁড়িতে খটখট শব্দ করে উঠে এলেন কাকাবাবু।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ''কী হয়েছে রে সন্তু?''

সন্তু বলল, ''কাকাবাবু দ্যাখো, দ্যাখো, আমাদের বিল্টু, সে ছবি এঁকে ফার্স্ট হয়েছে!''

বিল্টু এ বাড়িতে প্রায়ই আসে তার দিদির সঙ্গে। কাকাবাবু তার দুরন্তপনা খুব পছন্দ করেন। এই তো গত সপ্তাহেই সে কাকাবাবুর ঘরে ঢুকে একটা কাচের গ্লোব মাটিতে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলেছিল। রিনি তাকে শুধু বকুনিই নয়, তার কান ধরেও টেনেছিল। কাকাবাবু খুব রাগ করবেন ভেবে সন্তুও ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

কাকাবাবু কিন্তু রিনিকেই ধমক দিয়ে বলেছিলেন, ''অ্যাই, ওর কান ধরেছিস কেন রে? নিজের ভাইকে তুই শাসন করবি, কিন্তু অন্যদের সামনে

নয়। তাতে ছোটদের খুব অপমান হয়। আমার জিনিস ভেঙেছে, আমি বুঝব।''

বিল্টুর কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''বিল্টুবাবু, তুমি ইচ্ছে করে গ্লোবটা ভাঙলে কেন বলো তো? নাকি হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল?''

বিল্টু বলেছিল, ''জিয়োগ্রাফি বইয়ে যে লেখা আছে, পৃথিবীর পেটের মধ্যে গরম লাভা থাকে। তাই দেখতে গিয়েছিলাম।''

কাকাবাবু হেসে বলেছিলেন, ''ও, এই জন্য? তা বেশ করেছিস, ভেঙেছিস!''

এখন টিভির দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু সন্তুর মতোই অবাক হয়ে বললেন, ''বিল্টু আবার ছবিও আঁকতে পারে নাকি?''

ক্রাচদুটো রেখে তিনি একটা চেয়ারে বসলেন।

এখন বিল্টুর সাক্ষাৎকার নিচ্ছে অন্য একটা মেয়ে। তার পোশাক ছেলেদের মতো, চুলও খুব ছোট করে ছাঁটা। তবে সাক্ষাৎকারটা দিল্লিতে নয়, নেওয়া হয়েছে কলকাতায়। বোঝা যায়, আগে থেকে রেকর্ড করা। রিনিদের বাড়িটাও চেনা যাচ্ছে, ঘরের এক কোণে একটা বড় বুদ্ধমূর্তি। বিল্টুর মাকেও দেখা গেল একঝলক।

এই বয়সেই বিল্টু বেশ ইংরেজি বলতে পারে। ইংরেজি স্কুলে পড়া ছেলে। স্কুলে তো ইংরেজি বলেই সব সময়, বাড়িতেও বাংলার বদলে ইংরেজি বলা শুরু করেছিল। ওর ঠাকুরমা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ফোকলা দাঁতে হেসে বলেছিলেন, ''আমি তো দাদুভাই ইংরেজি জানি না। তোমার সঙ্গে তা হলে আর কথা বলাই হবে না।'' বিল্টু ঠাকুরমাকে খুব ভালবাসে। রোজ রাতে তাঁর কাছে গল্প শোনে। তাই ঠাকুরমার সঙ্গে সে আবার বাংলা বলতে শুরু করেছে। ঠাকুরমা অবশ্য ইংরেজি জানেন না তা নয়, তিনি একসময় একটা স্কুলের হেডমিসট্রেস ছিলেন।

ক্যামেরার সামনে একটুও ঘাবড়ায়নি বিল্টু। মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, ''তুমি ছবি আঁকা কার কাছে শিখেছ?''

বিল্টু উত্তর দিল, ''ফ্রম মাই এল্ডার সিস্টার। রিনি চক্রবর্তী। শি ইজ় আ গুড সিঙ্গার অলসো। আই কান্ট সিং!''

''ছবি আঁকা ছাড়া তুমি আর কী পারো?''

''দৌড়োতে পারি।''

"দৌড়োতে পারো? কোথায় দৌড়োও?"

"পাঁচতলা থেকে একতলা। সিঁড়ি দিয়ে।"

"কেন সিঁড়িতে দৌড়োও?"

"যারা লিফ্‌টে নামে, তাদের চেয়েও আমি তাড়াতাড়ি নামতে পারি।"

"বাঃ! তুমি এই বাঘের ছবিটা এঁকেছ কেন?"

"হাতির ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে না বলে।"

"কেন হাতির ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে না?"

"হাতির ছবি আঁকা সোজা!"

"তাই বুঝি? আর মানুষের ছবি?"

"দিদি মানুষের ছবি আঁকে। আমি দিদির মতো ভাল পারি না।"

"এই পুরস্কার পেয়ে তোমার কেমন লাগছে? ইন্ডিয়ার মধ্যে তুমি ফার্স্ট হয়েছ।"

"পুরস্কার, কই পাইনি তো?"

"পাবে। তোমাকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে।"

"ট্রেনে না প্লেনে? আমি প্লেনে চেপে যাব।"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "কী স্মার্টলি উত্তর দিচ্ছে বিল্টু। ওইটুকু ছেলে!"

সন্তু বলল,"পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। অত টাকা দিয়ে ও কী করবে?"

কাকাবাবু বললেন, "এখন জমিয়ে রাখবে। বড় হয়ে ওই টাকায় বেড়াতে যাবে। আমার এত ভাল লাগছে, ইচ্ছে করছে এখনই বিল্টুর সঙ্গে দেখা করতে!"

টিভি-তে এখন অন্য অনুষ্ঠান হচ্ছে। সন্তু সেটা বন্ধ করতেই আবার বেজে উঠল ফোন।

রিনি জিজ্ঞেস করল, "কী রে সন্তু, দেখলি?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ। তুই ভাগ্যিস ফোন করলি। তার ফলে কী হল বল তো? সারাদিন ফোনটা খারাপ ছিল, তুই কল করলি বলেই সেটা ঠিক হয়ে গেল! আর সেইজন্যই প্রোগ্রামটা দেখতে পেলাম! দুর্দান্ত ব্যাপার, বিল্টু যে এত ভাল ছবি আঁকতে পারে..."

রিনি বলল, "সারাক্ষণ তো ছটফট করে। যদি আর-একটু মন দিত, তা হলে ভবিষ্যতে..."

সন্তু বলল, ''বিল্টু তোর কাছাকাছি আছে? কাকাবাবু ওর সঙ্গে কথা বলতে চান।''

রিনি বলল, ''বিল্টু পাশের বাড়ি খেলতে গিয়েছে। আমি বরং কাল সকালে বিল্টুকে নিয়ে যাব তোদের বাড়ি। কাকাবাবুকে প্রণাম করতে!''

আজ সারাদিন পরপর কয়েকটা বাজে ব্যাপার ঘটছিল। বিল্টুর এই সুসংবাদে সব যেন ধুয়ে মুছে গেল। বাড়ির সকলে বারবার বলতে লাগলেন বিল্টুর কথা। এমনকী, কাকাবাবুও ম্যাপ ভিজে যাওয়ার জন্য তেমন কিছু মেজাজ খারাপ করলেন না। শুধু বললেন, ''ইস! যাক গে, খুব বেশি ক্ষতি হয়নি।''

২

বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে নেই, তাই অনেক সময়ই কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। আর বিল্টুর মতো কেউ যদি আসে, তা হলে এক মুহূর্তে বাড়ি একেবারে সরগরম হয়ে ওঠে!

এসেই বিল্টু প্রথমে সিঁড়ি দিয়ে দুমদাম শব্দ করে উঠে এল তিনতলায়। খয়েরি হ্যাফপ্যান্ট আর লাল শার্ট পরা।

সন্তু পড়াশোনা করছে, তার ঘরের দরজা ভেজানো। সেই দরজা এক ধাক্কায় খুলে বিল্টু বলল, ''সন্তুদাদা, টুকি!''

বই থেকে চোখ তুলে বিল্টুকে দেখেই খুশি হল সন্তু। সে বলল, ''আয়, আয়, ভিতরে আয়!''

বিল্টু বলল, ''না, ভিতরে যাব না। তুমি আমার সঙ্গে কম্পিটিশন দেবে, কে আগে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামতে পারে?''

সন্তু বলল, ''না, তোর সঙ্গে কম্পিটিশন দেব না। তুই তো চুরি করিস! তুই আমার সামনে এসে দু'হাত ছড়িয়ে আমাকে আটকে দিস।''

বিল্টু বলল, ''তুমি কেন একলাফে তিনটে সিঁড়ি যাও?''

সন্তু বলল, ''বেশ করি। তুই কেন রেলিং-এ চড়ে সরসরিয়ে যাস?''

বিল্টু হি হি করে হেসে উলটো দিকে ফিরল। তারপর একছুটে নেমে গেল দোতলায়।

কাকাবাবু রকিং চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে একটা বই পড়ছেন আর একটু-

একটু দুলছেন। তিনি পরে আছেন একটা খয়েরি-সাদা ডোরাকাটা ড্রেসিং গাউন।

বিল্টু বলল, ''কাকাদাদু, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং?''

কাকাবাবু মুখ তুলে বললেন, ''রিডিং।'' তারপর বললেন, ''কাকাদাদু কী রে ব্যাটা! মনে হয়, জাপানি নাম। শুধু কাকাবাবু বলবি।''

বিল্টু বলল, ''আমার মা বলেন কাকাবাবু, আর আমিও বলব কাকাবাবু?''

কাকাবাবু বললেন, ''হ্যাঁ, তাই বলবি। সকলে আমাকে কাকাবাবু বলে।''

বিল্টু বলল, ''বাবু তো বলতে হয় অচেনা লোকদের!''

কাকাবাবু বললেন, ''কাকাবাবুটাই আমার নাম। শুধু কাকা কিংবা কাকু বলে না কেউ।''

বিল্টু বলল, ''আমার একখানা মামা আছে, তাকে আমি মামাবাবু বলি না, বলি শুধু মামু।''

কাকাবাবু বললেন, ''তা বেশ করিস! কিন্তু মামা তো একখানা হয় না।''

বিল্টু বলল, ''কেন? হি ইজ় মাই ওনলি মামা।''

কাকাবাবু বললেন, ''বাংলায় একখানা জামা, একখানা বই, একখানা মাউথ অর্গান হয়। কিন্তু জ্যান্ত মানুষ সম্পর্কে বলতে হয় একজন। একজন মামা, একজন কাকা।''

বিল্টু বলল, ''আমার তিনখানা কাকা, নো, নো, তিনজন কাকা।''

কাকাবাবু বললেন, ''রাইট! এই তো ঠিক বলেছিস। শোন বিল্টু, তুই হারমোনিকা বাজাতে ভালবাসিস?''

বিল্টু বলল, ''কখনও তো বাজাইনি। হারমোনিকা কাকে বলে?''

কাকাবাবু বললেন, ''মাউথ অর্গান। তোকে আমি একটা সুন্দর হারমোনিকা কিনে দেব।''

বিল্টু চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, ''কেন কিনে দেবে?''

কাকাবাবু বললেন, ''তুই অল ইন্ডিয়ার মধ্যে ছবি আঁকায় ফার্স্ট হয়েছিস। সেইজন্য আমাদের খুব আনন্দ হয়েছে, গর্ব হয়েছে।''

বিল্টু অবহেলার সঙ্গে ঠোঁট উলটে বলল, ''ও তো সবাই ফার্স্ট হতে পারে!''

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, ''সবাই কী করে ফার্স্ট হবে? ফার্স্ট কথাটার মানেই তো যে সবার উপরে।''

বিল্টু বলল, ''ফার্স্টেরও উপরে কিছু হয় না?''

কাকাবাবু বললেন, ''না।''

বিল্টু একটু চিন্তিতভাবে বলল, ''মনে করো, ঝিল্লি...ঝিল্লিকে চেনো তো, আমাদের পাশের বাড়িতে থাকে, আমার চেয়ে মোটে দু'বছরের বড়, সেই ঝিল্লি যদি আরও ভাল একটা ছবি এঁকে ফেলে, তা হলে সে কী হবে?''

কাকাবাবু বললেন, ''তা হলে ঝিল্লিই হবে ফার্স্ট আর তুই হবি সেকেন্ড!''

বিল্টু বলল, ''ও।'' তারপরই সে বিষয় পালটে বলল, ''আচ্ছা কাকাবাবু, বলো তো, টিনটিন আর অ্যাসটেরিক্সের মধ্যে কার বেশি বুদ্ধি?''

কাকাবাবু বললেন, ''আমি টিনটিনের কথা জানি, কিন্তু অ্যাসটেরিক্সের গল্প পড়িনি।''

বিল্টু বলল, ''আমি তোমায় পড়তে দেব।''

আবার সে অন্য কথা শুরু করল।

কাকাবাবু মজা লাগল দেখে যে, বিল্টু এত বড় একটা প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছে, তা নিয়ে তার কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। আর-একটু বেশি বয়সের ছেলে হলে সে কত গর্ব করত!

কাকাবাবু বললেন, ''তুই তো পুরস্কার আনতে প্লেনে চেপে দিল্লি যাবি। এই প্রথম তোর প্লেনে চাপা হবে।''

বিল্টু বলল, ''প্লেন তো মেঘের উপর দিয়ে যায়, তাই না?''

কাকাবাবু বললেন, ''অনেক উপর দিয়ে।''

বিল্টু বলল, ''প্লেন যখন মেঘের মধ্যে দিয়ে উঠবে, তখন জানলা খুলে মুখ বাড়িয়ে একটুখানি মেঘ খেয়ে নেওয়া যায় না?''

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, ''দুর বোকা! প্লেনের জানলা খোলা যায় নাকি? তা হলেই সর্বনাশ।''

বিল্টু বলল, ''কেন খোলা যাবে না? আমি খুলব!''

সন্তু নেমে এসে বিল্টুর পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ''কী খুলবি তুই?''

কাকাবাবু বললেন, ''দ্যাখ না, ও বলছে, প্লেনের জানলা খুলে মেঘ খাবে!''

সন্তু বলল, ''প্লেনের জানলা তো খোলা যায় না। তবে গ্যাংটকে গেলেই তো মেঘ খাওয়া যায়। গায়ের উপর দিয়ে মেঘ চলে যায়।''

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, ''তুমি খেয়েছ?''

সন্তু বলল, "কতবার!"

বিল্টু আবার জিজ্ঞেস করল, "কীরকম খেতে?"

সন্তু বলল, "গ্যাংটকের মেঘ টক টক!"

কাকাবাবু বললেন, "বৃষ্টি পড়লে মিষ্টি হয়ে যায়।"

বিল্টু বলল, "আমি তা হলে গ্যাংটক যাব। আমায় নিয়ে চলো না!"

সন্তু বলল, "এখন তো হবে না। আগে তোকে দিল্লি যেতে হবে।"

বিল্টু বলল, "না, আমি দিল্লি যাব না। আমি গ্যাংটক যাব।"

সন্তু বলল, "সে কী রে! দিল্লিতে তোকে ফার্স্ট প্রাইজ় দেবে। অনেক টাকা পাবি।"

বিল্টু বলল, "আমার অনেক টাকা আছে। আমি জমিয়েছি। দেখবে?" হাফপ্যান্টের পকেট থেকে সে একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করল। সেটার মুখ খুলে হাতে ঢেলে দেখাল কয়েকটা এক টাকা-দু'টাকার নোট আর বেশ কিছু খুচরো পয়সা।

বিল্টু গম্ভীরভাবে বলল, "থার্টি ওয়ান রুপিজ়।"

সন্তু বলল, "সত্যিই তো অনেক টাকা!"

কাকাবাবু বললেন, "এই একত্রিশ টাকার দাম পঁচিশ হাজারের চেয়েও বেশি। কারণ, এই টাকাটা ও নিজে জমিয়েছে।"

সন্তু বিল্টুকে বলল, "তোর নিজের টাকা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তোর প্রাইজ়ের টাকাটাও নিতে হবে।"

বিল্টু বলল, "কেন? এই টাকায় গ্যাংটক যাওয়া যাবে না?"

কাকাবাবু বললেন, "যত দিন মানুষ টাকার হিসেব না বোঝে, তত দিনই সে আসলে সুখী!"

রিনি উপরে এসে বলল, "অ্যাই বিল্টু, তোকে জ্যাঠামণি একবার ডাকছেন। চল, নীচে চল।"

সন্তুর বাবা পা মচকে বিছানায় শুয়ে আছেন। সকলে মিলে চলে এল তাঁর ঘরে।

বুলবুলিপিসি বললেন, "ও মা, এইটুকু ছেলে ছবি আঁকায় ফার্স্ট হয়েছে?"

রিনি বলল, "এইটুকু আবার কী! ও ফার্স্ট হয়েছে ছোটদের গ্রুপে। সকলে ওর মতোই ছোট।"

বুলবুলিপিসি বললেন, "তবু অতজনের মধ্যে ফার্স্ট হওয়া কি সোজা

কথা? ওর নিশ্চয়ই খুব বুদ্ধি!''

সন্তু বলল, ''ওর মাথায় অনেক দুষ্টুবুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু বুদ্ধি থাকলেই ছবি আঁকা যায় না। ছবি আঁকা শিখতে হয়। ও যে ধৈর্য ধরে ছবি আঁকা শিখেছে, সেটাই আশ্চর্যের!''

কাকাবাবু বললেন, ''শিখলেও সকলে শিল্পী হতে পারে না। আঁকার হাত থাকা দরকার। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, আমার হাতে ছবি একেবারেই আসে না।''

মা চাবি দিয়ে একটা দেওয়াল-আলমারি খুললেন। তার থেকে একটা নীল রঙের ভেলভেটের বাক্স বের করে দিলেন বাবার হাতে।

বাবা বললেন, ''বিল্টুবাবু, গভর্নমেন্ট তো তোমাকে পুরস্কার দিচ্ছেই। তার আগে আমরা তোমাকে একটা পুরস্কার দিতে চাই। একবার আমি একটা পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে এই মেডেলটা পেয়েছিলাম। এটা এখন তোমার।''

বাক্সটা খুলে দেখালেন। বেশ বড় একটা গোল সোনার মেডেল।

বিল্টু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল, ''এটা নিয়ে আমি কী করব?''

বাবা বললেন, ''বাড়িতে রেখে দেবে। এরপর তুমি নিশ্চয়ই আরও অনেক মেডেল পাবে। তার মধ্যে এটাই হবে প্রথম। আমি বুড়ো হয়েছি, আমি আর মেডেল দিয়ে কী করব?''

বিল্টু তবু জিজ্ঞেস করল, ''তুমি এটা সন্তুদাদাকে দাওনি কেন?''

বাবা বললেন, ''সন্তুকে? সন্তু তো কিছুতে ফার্স্ট টার্স্ট হয়নি।''

বিল্টু বলল, ''হ্যাঁ, সন্তুদাদা সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নামায় ফার্স্ট হয়!''

সকলে হেসে উঠল।

বাবা বললেন, ''সে জন্য না হোক, অন্য কোনও কারণে ওর কাকাবাবু ওকে কী সব পুরস্কার-টুরস্কার দেন মাঝে মাঝে। সন্তু, তুই বোধহয় একবার অল বেঙ্গল সুইমিং কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিলি, তাই না?''

সন্তু বলল, ''ফার্স্ট না, সেকেন্ড।''

বাবা বললেন, ''সে যাই হোক, বিল্টুবাবু, তুমি আমার একটা ছবি এঁকে দেবে?''

বিল্টু বলল, ''আমি তো মানুষের ছবি আঁকতে পারি না। দিদি পারে।''

বাবা বললেন, ''তোমার দিদি তো ভাল ছবি আঁকে জানিই। সন্তুর একটা চমৎকার ছবি এঁকে দিয়েছে। তুমি মানুষের ছবি আঁকো না কেন?''

বিল্টু বলল, ''মানুষগুলো যে সব আলাদা আলাদা।''

বাবা বললেন, ‘‘তা ঠিক। তুমি যে বাঘের ছবি আঁকলে, বাঘ দেখলে কোথায়? চিড়িয়াখানায়?’’

বিল্টু বলল, ‘‘বাঘ তো ইচ্ছে করলেই সব সময় দেখা যায়।’’

বাবা বললেন, ‘‘কী করে? কী করে? ছবিতে?’’

বিল্টু বলল, ‘‘না, না। তুমি চোখ বোজো, তারপর মনে মনে ভাবো, বাঘ বাঘ! অমনই বাঘ দেখতে পাবে। চোখ বুজে যে-কোনও জিনিসের কথা ভাবলেই সেটা দেখা যায়!’’

কাকাবাবু বিল্টুর পিঠ চাপড়ে বললেন, ‘‘বাঃ বাঃ! এ যে একেবারে পাক্কা আর্টিস্টের মতো কথা। এ ছেলে অবশ্যই ভবিষ্যতে খুব বড় আর্টিস্ট হবে।’’

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, ‘‘ভবিষ্যৎ মানে ফিউচার?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘হ্যাঁ।’’

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, ‘‘কতদিনে ফিউচার হয়?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘একদিন পরেও ফিউচার, আবার একশো বছর পরেও! তবে তোর সম্পর্কে যা বলছি, তা আরও দশ-বারো বছর পরেই বোঝা যাবে।’’

বিল্টু বলল, ‘‘মাই গড। আমার ফিউচার এত দূরে?’’

৩

বিল্টুদের পাশের বাড়ির দুটি মেয়ে পড়ে মর্ডান হাই স্কুলে। আর পার্কের দু’পাশে বাড়ির দুটি ছেলে পড়ে সেন্ট লরেন্সে। বিল্টু ডন বস্কোতে। এই পাঁচজন একসঙ্গে স্কুলে যায়। একটা ভাড়ার গাড়ি ওদের তুলে নিয়ে যায়, ছুটির পরে ফিরিয়ে আনে। কোনওদিন ভুল হয় না। তিনটে স্কুলেরই ছুটির সময় মোটামুটি এক। কোনওদিন কারও একটু আগে ছুটি হয়ে গেলে সে অপেক্ষা করে গাড়ির জন্য।

বিকেল সাড়ে চারটের কাছাকাছি সময় বাড়ির সামনে একবার হর্ন বাজলেই বিল্টুর মা বুঝতে পারেন যে বিল্টু এসে গিয়েছে। সেই সময় সদর দরজা খোলাই থাকে। একটু পরেই মা শুনতে পান সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ। রিনি কলেজে পড়ে। তার ফিরতে ফিরতে সাড়ে পাঁচটা বেজে যায়। বাবা অফিস থেকে ফেরেন সাতটার পর।

বিল্টুর মা জয়ন্তী শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিলেন। রিনিকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি বইটা সরিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘কী রে, আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এলি যে?’’

রিনি বলল, ‘‘তাড়াতাড়ি? এখন পৌনে ছ’টা বাজে।’’

জয়ন্তী ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, ‘‘পৌনে ছ’টা? বিল্টু যে এখনও ফেরেনি!’’

রিনির ভুরু কুঁচকে গেল। সে আপনমনে বলল, ‘‘বিল্টু এখনও ফেরেনি?’’

সে চলে এল বারান্দায়। রেলিং-এ একটু ঝুঁকে ডাকল, ‘‘খুশি, এই খুশি!’’

দু’-তিনবার ডাকার পর পাশের বাড়ির বারান্দায় একটি লম্বামতো ছেলে এসে দাঁড়াল। সে বলল, ‘‘কী বলছেন, দিদি?’’

রিনি বলল, ‘‘শিবু, খুশি আর টুসি ফিরেছে স্কুল থেকে?’’

শিবু বলল, ‘‘না গো দিদি, ওদের স্কুলের গাড়ি এখনও আসেনি।’’

রিনি বলল, ‘‘এখনও আসেনি? প্রায় ছ’টা বাজে। এত দেরি হবে কেন?’’

শিবু বলল, ‘‘আমরাও তো তাই ভাবছি। হয়তো ট্রাফিক জ্যামে আটকেছে। টিভির খবরে বলছিল, পার্ক সার্কাসে নাকি কীসের একটা মিছিল বেরিয়েছে।

রিনি জিজ্ঞেস করল, ‘‘ওই ভাড়া গাড়ির ড্রাইভারের কাছে মোবাইল নেই?’’

শিবু বলল, ‘‘আছে তো। কিন্তু আমি তো নম্বর জানি না। দিদিমণিরা জানেন।’’

রিনি বলল, ‘‘আমার মোবাইলে বোধহয় নম্বরটা তোলা আছে। আচ্ছা, আমি দেখছি।’’

ঘরের ভিতরে এসে হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে মোবাইলটা খুঁজতে খুঁজতে রিনির মনে পড়ল, আগের সপ্তাহেই তার পুরনো মোবাইলটা হারিয়ে গিয়েছে। এটা নতুন। এটার মধ্যে কোনও নম্বরই সেভ করা নেই।

জয়ন্তী এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। এই রাস্তা দিয়ে অনেক গাড়ি যায়। বিল্টুদের জন্য ভাড়া গাড়িটা সাদা রঙের। ডান দিক দিয়ে কোনও সাদা গাড়ি আসতে দেখলেই জয়ন্তী উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাচ্ছেন। কিন্তু কোনও গাড়িই থামছে না।

একটু পরেই জয়ন্তী অস্থির হয়ে বললেন, ‘‘রিনি, এখনও তো এল না। কী করা যায় বল তো!’’

রিনি বলল, ‘‘ওরা পাঁচজন একসঙ্গেই তো আছে। চিন্তার কিছু নেই। তবু আমি স্কুলে একটা ফোন করে দেখছি।’’

ডন বস্কো স্কুলে ফোন বেজে গেল। অনেকক্ষণ ছুটি হয়ে গিয়েছে। অফিসে কেউ নেই।

এবার একটা সাদা গাড়ি থামল পাশের বাড়ির গেটের কাছে। রিনি এসে দাঁড়াল বারান্দায় মায়ের পাশে। গাড়ি থেকে নামল খুশি আর টুসি। বিল্টু তো নামল না! খুশি আর টুসি নিজেদের বাড়িতে না ঢুকে তাকাল এই বারান্দার দিকে।

জয়ন্তী চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘বিল্টু নামছে না? ও গাড়ির মধ্যে বসে আছে কেন?’’

খুশি বলল, ‘‘বিল্টু গাড়িতে নেই। ও বাড়ি ফিরে আসেনি?’’

রিনি বলল, ‘‘না তো! ও একলা ফিরবে কী করে? ও তো তোদের সঙ্গেই ফেরে।’’

গাড়ির ড্রাইভার বিমল রাস্তায় নেমে বলল, ‘‘আমি উপরে আসছি মাসিমা।’’

পাশের বারান্দা থেকে শিবু দেখছে। তার দিকে হাত নেড়ে খুশি আর টুসিও বিমলের সঙ্গে চলে এল এ বাড়ির দোতলায়।

বিমল বলল, ‘‘মাসিমা, বিল্টু তো স্কুলে নেই।’’

জয়ন্তী বললেন, ‘‘নেই মানে? কোথায় বিল্টু?’’

খুশি বলল, ‘‘আমাদের যেতে একটু দেরি হয়েছে। গেটের দরোয়ান বলল, বিল্টু ওখানেই ছিল, হঠাৎ কোথায় যেন চলে গিয়েছে!’’

টুসি বলল, ‘‘আর-একজন দরোয়ান বলল, রাস্তা পেরিয়ে উলটো দিকে গিয়েছে বোধহয়। দ্যাখো গিয়ে পার্কে।’’

জয়ন্তী বললেন, ‘‘ও নিজে নিজে রাস্তা পেরোবে? ওই রাস্তায় কত গাড়িটাড়ি চলে!’’

বিমল বলল, ‘‘আমরা বারণ করেছি ও শোনেনি। পার্কে তো ফুটবল খেলা হয়। ও রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে সেই খেলা দ্যাখে।’’

টুসি বলল, ‘‘আজও সেখানে খেলা হচ্ছে। আমরা সকলে মিলে গেলাম। কিন্তু সেখানেও বিল্টু নেই। অনেক খুঁজলাম।’’

জয়ন্তী ঝাঁঝালো গলায় বললেন, ''তারপর তোমরা বিল্টুকে না নিয়ে চলে এলে?''

বিমল বলল, ''আমরা ভাবলাম, বিল্টু নিজেই বাড়ি চলে এসেছে।''

রিনি ধমক দিয়ে বলল, ''এ কথা তোমরা ভাবলে কী করে? ওইটুকু ছেলে একা একা বাড়ি ফিরতে পারে?''

বিমল এবার টুসি আর খুশির মুখের দিকে তাকাল। তারপর কাঁচুমাচুভাবে বলল, ''একটা কথা আপনাদের বলা হয়নি। কয়েক দিন আগে...''

টুসি বলল, ''গত সোমবার...''

বিমল বলল, ''গত সোমবার, আমরা বাড়ি ফিরছি, আপনাদের ছেলে তো যেমন জেদি, তেমনই সাহসী, কী নিয়ে যেন টুসির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। গাড়িটা যখন একটা সিগনালের লাল আলোয় থেমেছে, বিল্টু অমনই বলল, 'আমি টুসির সঙ্গে বাড়ি যাব না!' বলে সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল।''

জয়ন্তী একটা ভয়ের শব্দ করে উঠলেন।

বিমল বলল, ''নেমেই সে ছেলে উঠে পড়ল একটা রিকশায়। রিকশাওয়ালাকে বলল, 'অ্যাই, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো। সোজা রাস্তা। অন্য কোনওদিকে গেলে স্কেল দিয়ে তোমায় মারব!' রিকশাটা চলতে শুরু করেছিল। আমি সামনে গিয়ে সেটাকে আটকালাম। কিন্তু যতই কাকুতি-মিনতি করি, কিছুতেই সে শুনতে চায় না। সে রিকশাতেই বাড়ি ফিরবে।''

খুশি বলল, ''বিল্টুর হাতে একটা স্কেল। সেই স্কেল দিয়ে সে সকলকে মারবে!''

বিমল বলল, ''রাস্তায় ভিড় জমে গিয়েছিল!''

টুসি বলল, ''তারপর কী হল জানো তো মাসি? আমার সঙ্গে তো বিল্টুর ঝগড়া হয়েছিল। আমিও টপ করে সেই রিকশায় উঠে পড়ে বললুম, 'আমার উপর রাগ করেছিস তো? ঠিক আছে, ওই স্কেল দিয়ে আমাকে মার। কিংবা আমিও তোর সঙ্গে এই রিকশায় যাব!' ''

খুশি বলল, ''তাতেও ছেলের রাগ যায় না। সে একাই বাড়ি ফিরবে। তখন আমি আর টুসি দু'দিক থেকে যে-ই কাতুকুতু দিলাম, অমনই হাসতে হাসতে...''

বিমল বলল, ''তাই ওকে না পেয়ে ভাবলুম, একা রিকশায় বাড়ি ফেরার

সাহস যখন ওর হয়েছে, আজও আমাদের দেরি দেখে ও বাড়ি চলে আসতে পারে।''

রিনি জিজ্ঞেস করল, ''তোমাদের যেতে দেরি হল কেন?''

বিমল বলল, ''পার্ক সার্কাসের কাছে মিছিলে অনেক গাড়ি আটকে গিয়েছিল, রাস্তা জ্যাম।''

জয়ন্তী উতলা হয়ে বললেন, ''কিন্তু রিকশায় এলেও তো এতক্ষণে পৌঁছে যাওয়ার কথা। একেবারে সোজা রাস্তা।''

বিমল কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ''আমি গোটা রাস্তা খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে এলুম। কোনও রিকশাতেই বিল্টুবাবু নেই।''

রিনি বলল, ''চলো তো বিমল, তোমার গাড়িতেই আমি স্কুল পর্যন্ত একবার ঘুরে আসি। দেখি যদি কোথাও...''

জয়ন্তী বললেন, ''আমিও যাব তোর সঙ্গে।''

রিনি বলল, ''না, মা, তুমি থাকো। তুমি বরং সিদ্ধার্থদাকে একটা ফোন করো। না, থাক, এখনই ফোন করার দরকার নেই। আমি ফিরে আসি, তখনও যদি কোনও খবর না পাই...'' রিনি নেমে গিয়ে বিমলের গাড়িতে উঠে বসল।

এর মধ্যে সন্ধে হয়ে এসেছে। আলো জ্বলে উঠেছে রাস্তায়। সব বাড়িতেও আলো জ্বলছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটছে অনেক মানুষ, প্রচুর গাড়িও চলছে স্বাভাবিকভাবে। সব কিছুই অন্য দিনের মতো। শুধু বিল্টুর দেখা নেই!

রিনি স্কুল পর্যন্ত গেল। গেট একেবারে বন্ধ। উলটো দিকের পার্কেও ফুটবল খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। তা হলে বিল্টু কোথায় গেল? সে এমনিতে যতই দুষ্টুমি করুক, একা-একা বাড়ির বাইরে কোথাও যায় না।

রিনি ফিরে এসে দেখল, জয়ন্তীর দু'পাশে বসে আছে খুশি, টুসি, আর ওদের মা শিখা টেলিফোন করছেন। বিল্টুর ক্লাসের কয়েকটা ছেলের কাছে জানা গিয়েছে যে, বিল্টু শেষ পর্যন্ত ক্লাসেই ছিল। ছুটির পর সে কোথায় গিয়েছে, তারা জানে না। রিনির বাবার অফিস সল্টলেকে। এক-একদিন তাঁর ফিরতে বেশ দেরি হয়ে যায়। আজ তিনি বলে গিয়েছেন, তাঁর জরুরি মিটিং আছে। এখনই তাঁকে খবর দিলে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কাজ শেষ না করেই নিশ্চয়ই চলে আসবেন। তার আগে রিনি ফোন করল তার দিদির বাড়িতে।

স্নিগ্ধা জিজ্ঞেস করল, ''কী রে রিনি, হাঁফাচ্ছিস কেন? কী হয়েছে? সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গিয়েছিস?''

রিনি বলল, ‘‘না, দিদি, শোনো, একটা ব্যাপার হয়েছে, আগেই ভয় পেয়ে যেয়ো না। মানে, বিল্টু এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি, আর সকলে ফিরে এসেছে।’’

স্নিগ্ধা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ‘‘অ্যাঁ, কী বলছিস? বিল্টু? কী হয়েছে? অ্যাক্সিডেন্ট?’’

স্নিগ্ধার কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল, ‘‘কী হয়েছে রে রিনি? তোর দিদির তো মনে হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক হবে! বিল্টু কোথায়? কখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে?’’

রিনি বলল, ‘‘অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিনা জানি না। যে গাড়িটা বিল্টুকে স্কুল থেকে আনতে যায়, সে গাড়িতে বিল্টু আসেনি। ওরা তাকে খুঁজে পায়নি।’’

সবটা শোনার পর সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘শোন, এখন মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। অনেক কিছুই হতে পারে, আবার হয়তো কিছুই হয়নি। এখনই হয়তো কেউ বিল্টুর হাত ধরে পৌঁছে দিতে পারে। এরকম হয়। আমি তোর দিদিকে নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে তোদের বাড়িতে পৌঁছে যাব। তার আগে দু’-একটা হাসপাতালে খোঁজ নিতে হবে।’’

সিদ্ধার্থ রেখে দেওয়ার একটু পরেই আবার বেজে উঠল ফোন।

এবার একটি অচেনা কণ্ঠ প্রথমেই বলল, ‘‘পুলিশে খবর দেননি তো? দিলেও অবশ্য পুলিশ এত তাড়াতাড়ি কোনও অ্যাকশন নেয় না। শুনুন।’’

রিনি জিজ্ঞেস করল, ‘‘আপনি কে বলছেন?’’

ভদ্রলোকটি বললেন, ‘‘আমার নাম সুপ্রিয় রায়। আপনার ভাই আমার কাছে আছে। চিন্তার কিছু নেই। একটু পরেই ফেরত যাবে।’’

রিনি আবার জিজ্ঞেস করল, ‘‘আমার ভাই আপনার কাছে গেল কী করে? আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না!’’

সুপ্রিয় রায় বললেন, ‘‘আমায় চিনবেন কী করে? আমিও তো আপনাকে চিনি না। একটু আগে আপনার ভাইয়ের কাছে আপনার নাম শুনলাম। ফোন নম্বরটাও জেনে নিলাম।’’

রিনি বলল, ‘‘আমার ভাই, আমার ভাইকে আপনি আগে চিনতেন?’’

সুপ্রিয় বললেন, ‘‘না। আজ বিকেলবেলা ছেলেটি একটি পার্কের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল, এমন সময় একটা স্কুটারের সঙ্গে ওর ধাক্কা লাগে। যে চালাচ্ছিল, তার খুব দোষ নেই। ছেলেটি হঠাৎ দৌড়ে এসে পড়েছিল। ধাক্কা লেগে ছেলেটি ছিটকে পড়ে যায়, তাতে ওর মাথা ফেটে... আরে শুনুন,

শুনুন, তেমন সিরিয়াস কিছু নয়। ছোট ছেলেমেয়েদের মাঝে মাঝে ওরকম মাথা ফাটে। তাতে এমন কিছু হয় না। খানিকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল, এখন জ্ঞান ফিরেছে। দিব্যি কথা বলছে, এক গেলাস গরম দুধও খেল।''

রিনি বলল, ''বিল্টু আপনার কাছে আছে। আপনার বাড়ি কোথায়?''

সুপ্রিয় বললেন, ''এই তো বেকবাগানে। আমি ডাক্তার, এখানেই আমার চেম্বার। সেই স্কুটার চালকই আমার কাছে পৌঁছে দিল। আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি, সব ঠিকঠাক আছে, হাড়টাড় কিছু ভাঙেনি, চিন্তা করবেন না। অকারণ থানা-পুলিশ করে কোনও লাভ নেই। এখনই আমার চেম্বার বন্ধ হবে, আমি নিজে গিয়ে ওকে পৌঁছে দিয়ে আসছি। বড়জোর আধঘণ্টা লাগবে।''

রিনি বলল, ''আপনি কেন কষ্ট করে আসবেন। আপনি যথেষ্ট উপকার করেছেন। আপনি ঠিকানাটা বলুন, আমরাই ওকে নিয়ে আসছি।''

সুপ্রিয় বললেন, ''কষ্টের কী আছে? আমি ওই পথ দিয়েই যাব। ছেলেটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।''

রিনি বলল, ''ডাক্তার রায়, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি আমাদের জন্য যা করলেন!''

সুপ্রিয় হেসে বললেন, ''দাঁড়ান, আগে পৌঁছে দিই। তারপর তো ধন্যবাদ দেবেন। শুধু ধন্যবাদ দিলে চলবে না, মিষ্টি খাওয়াতে হবে। ঠিক আধঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে...''

ফোনটা রেখে দেওয়ার পর রিনির চোখে জল এসে গেল। খুব আনন্দের সময় এরকম হয়। জয়ন্তী অন্য একটা রিসিভারে সব শুনেছেন, তিনি এসে জড়িয়ে ধরলেন রিনিকে।

রিনি বলল, ''দ্যাখো, পৃথিবীতে এখনও কত ভাল মানুষ আছেন। এই ডাক্তারটি বিল্টুকে সুস্থ করে তুলেছেন, আবার নিজে পৌঁছে দিতে আসছেন। বিল্টুকে দুধও খাইয়েছেন।''

জয়ন্তী বললেন, ''বাড়িতে তো কিছুতেই দুধ খেতে চায় না। ওখানে খেয়ে নিল?''

রিনি বলল, ''ডাক্তাররা জানেন কী করে খাওয়াতে হয়!''

জয়ন্তী জিজ্ঞেস করলেন, ''হ্যাঁরে, কতটা মাথা ফেটেছে? অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল?''

রিনি বলল, ''খুব বেশি নয় নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরেছে। গত

মাসেও তো বিল্টুর একবার মাথা ফেটেছিল। এ ছেলেকে আরও শক্ত করে সামলে রাখতে হবে মা।''

জয়ন্তী বললেন, ''আমার এখনও বুক কাঁপছে। ভাবতেই পারছি না। স্কুটারের ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল ছেলেটা...এখন সে কী অবস্থায় আছে?''

রিনি বলল, ''আর আধঘণ্টার মধ্যেই তো দেখতে পাবে।''

এরপর শুধু প্রতীক্ষা। এখন প্রতিটি মিনিটই মনে হয় খুব লম্বা। রাস্তায় যে-কোনও গাড়ি থামলেই দৌড়ে যেতে হয় বারান্দায়। এর মধ্যে আবার লোডশেডিং হয়ে গেল। সমস্ত পাড়া জুড়েই অন্ধকার। সময় যেন আর কাটতেই চায় না। আলোর চেয়ে অন্ধকারকে আরও বেশি লম্বা মনে হয়।

ঘরের মধ্যে গরম, তাই মা আর মেয়ে দু'জনেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে। একসময় বেজে উঠল ফোন। অন্ধকারে ঝনঝন শব্দটাও যেন বেশি জোরালো।

এবারে ফোন ধরলেন জয়ন্তী। তিনি হ্যালো বলতেই একটি গম্ভীর কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, ''এ বাড়িতে কি পুরুষমানুষ কেউ নেই?''

জয়ন্তী বললেন, ''আপাতত কেউ নেই। আপনি কী বলতে চান, আমাকে বলতে পারেন।''

সেই গম্ভীর কণ্ঠ বলল, ''আপনাকে বললে ঠিক কাজ হবে না। ব্যাবসা-বাণিজ্যের ব্যাপার। আপনাদের ছেলে এখন আমাদের কাস্টডিতে আছে। আপনারা তাকে ফিরে পেতে চাইলে কয়েকটি শর্ত মানতে হবে।''

জয়ন্তী চমকে উঠে বললেন, ''আপনি কে বলছেন? আপনি ডাক্তার সুপ্রিয় রায়?''

গম্ভীর কণ্ঠ বিরক্তভাবে বলল, ''কে সুপ্রিয় রায়?''

জয়ন্তী বললেন, ''আপনি একটু আগে ফোন করেননি? আপনি যে বললেন, আপনি আমার ছেলেকে নিয়ে আসছেন?''

লোকটি বলল, ''কে ওই সব বলেছে, আমি জানি না। আপনার ছেলে এখন আমার কাছে। তাকে এখন ফেরত পাওয়া যাবে না।''

জয়ন্তী চিৎকার করে বলে উঠলেন, ''অ্যাঁ? এসব কী বলছেন? কে আপনি?''

লোকটি বলল, ''এই জন্যই মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করা যায় না। আপনার হাজ়ব্যান্ড কখন ফিরবেন?''

বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামল। রেলিং থেকে ঝুঁকে রিনি দেখতে

চাইল, সেই গাড়ি থেকে বিল্টু নামছে কিনা। তারপর চেঁচিয়ে বলল, ''মা, দিদি-সিদ্ধার্থদারা এসে গিয়েছে। আমি নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিচ্ছি।''

টেলিফোনের লোকটি বলল, ''ঠিক আছে। আমি আবার দু'ঘণ্টা পরে ফোন করব।''

জয়ন্তী বললেন, ''না, না, ধরুন, ধরুন, এসে গিয়েছে!''

লোকটি বলল, ''কে এসে গিয়েছে? আপনার স্বামী ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে আমি কথা বলব না।''

জয়ন্তী বললেন, ''এ আমাদের বাড়ির জামাই। বাড়ির ছেলেরই মতো। ও সব কিছুর দায়িত্ব নিতে পারে।''

লোকটি বলল, ''আমি আর ঠিক তিরিশ সেকেন্ড ফোন ধরে থাকব।''

জয়ন্তী চেঁচিয়ে বললেন, ''সিদ্ধার্থ, তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি এসো।''

এক-এক লাফে দু'-তিনটে সিঁড়ি পেরিয়ে সিদ্ধার্থ উঠে এল দোতলায়। অন্ধকারের মধ্যে হোঁচট খেল একবার।

জয়ন্তীর উঁচু করা হাত থেকে ফোনটা নিয়ে সে বলল, ''হ্যালো, সিদ্ধার্থ ঘোষ স্পিকিং।''

গম্ভীর গলার লোকটি বলল, ''আমি একটা বিজনেস কোম্পানি থেকে বলছি। প্রথম কথাই হল, আপনাদের বাড়ির ছেলে বিল্টু আমাদের কাছে আছে। সে বেশ ভাল আছে। তার জন্য চিন্তা করার কোনও কারণ নেই।''

পাশ থেকে জয়ন্তী বললেন, ''ওর মাথা ফেটেছে!''

লোকটি বলল, ''না, মাথাটাথা ফাটেনি। হঠাৎ মাথা ফাটবে কেন? গায়ে একটু ধুলোও লাগেনি। শুনুন, বেশি সময় নেই...''

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল, ''আপনাদের কীসের বিজনেস?''

লোকটি বলল, ''অর্ডার সাপ্লাই। অনেক কিছু সাপ্লাই করি। তার মধ্যে ছোট ছেলেদের বাজারদর খুব ভাল।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''বাজারদর মানে? আপনারা ছোট ছেলেদের ধরে ধরে বিক্রি করেন?''

লোকটি বলল, ''আমরা ধরি না। ওসব ঝামেলায় আমরা যাই না। অন্য লোকেরা ধরে, তারপর আমাদের কাছে বিক্রি করতে দিয়ে যায়। আমরা কমিশন নিই। আর প্রশ্ন করবেন না, পরপর যা বলি শুনে যান। কাগজ-কলম থাকলে লিখেও নিতে পারেন।''

রিনি দৌড়ে পাশের ঘর থেকে একটা ছোট্ট টেপ রেকর্ডার এনে নিঃশব্দে রাখল ফোনের পাশে।

সিদ্ধার্থ বলল, ''কাগজ-কলম লাগবে না। আপনি বলুন, আমার মনে থাকবে।''

লোকটি বলল, ''প্রথম কথা হল, আমি কোথা থেকে ফোন করছি, তা কোনওক্রমেই খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর কোনও পুলিশই পারবে না। সুতরাং, এখানকার পুলিশদের জানালে কোনও লাভই হবে না। দু'নম্বর, পুলিশকে জড়ালে আপনাদের বিপদই হবে। পুলিশকে কিছু জানাবেন না। তিন, যে বেশি দাম দেবে, তাকেই আমরা জিনিস বিক্রি করব। এটাই তো ব্যাবসার নিয়ম। ছোট ছেলেদের বিদেশে খুব চাহিদা। তবে কম বয়সের ছেলে হলে আগে আমরা বাবা-মায়ের কাছেই অফার দিই। এ ছেলের দাম ধরা হয়েছে কুড়ি লাখ টাকা। আগামী পাঁচদিনের মধ্যে পুরো টাকা দিয়ে দিলে ছেলেকে আমরা নিখুঁত অবস্থায় ফেরত দেব। কোয়ালিটি গ্যারান্টিড। ছেলে হাসতে হাসতে ফিরে আসবে। চার, টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কোনও গন্ডগোল করলে কিংবা পিছনে পুলিশ নিয়ে এলে আপনাদের ছেলের প্রাণের দায়িত্ব আমরা নিতে পারব না। ও কে? এটা ভাল করে মনে রাখতে হবে। ছেলেকে ফিরে পেতে হলে টাকাটা দিতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও অল্টারনেটিভ নেই।''

সিদ্ধার্থ এর মধ্যে বলে উঠল, ''কিন্তু এত টাকা আমরা দেব কী করে? আমরা কী দোষ করেছি?''

লোকটি বলল, ''নো কোয়েশ্চেন, নো কোয়েশ্চেন! আমি যা বলব, শুনে যান। টাকাটা কবে, কখন আর কোথায় দিতে হবে, তা আমরা দু'দিনের মধ্যে জানিয়ে দেব। কুড়ি লাখ টাকা!''

সিদ্ধার্থ বলল, ''শুনুন, শুনুন, এর মধ্যে যদি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, তা হলে কোথায় যোগাযোগ করব? বিল্টুর বাবা এখনও কিছু জানেন না। তিনি যদি কথা বলতে চান আপনাদের সঙ্গে, কোন নম্বরে আপনাদের পাব?''

লোকটি ঠিক দু'বার শুকনোভাবে হা হা করে হাসল। তারপর বলল, ''খুব চালাক, তাই না? আমরা একটা নম্বর দেব, অমনই একঝাঁক পুলিশ গিয়ে সেখানে হাজির হবে? না, না, না, না, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনও দরকার নেই। আমরাই যোগাযোগ করব। এবার শেষ দরকারি কথা।

আপনাদের এক খোঁড়া আত্মীয় আছে, রাজা রায়চৌধুরী, অনেকে তাকে কাকাবাবু বলে। সে লোকটা যেন কোনওক্রমেই এর মধ্যে মাথা না গলায়। তাকে আপনারা জানিয়ে দেবেন, তার উপর আমরা নজর রাখছি। সেই রাজা রায়চৌধুরী কোনওরকম কায়দাকানুন করতে গেলে ছোট ছেলেটির জীবন সম্পর্কে আমাদের আর দায়িত্ব থাকবে না। প্রথমে তার ডেডবডি ডেলিভারি দেওয়া হবে। তারপর রাজা রায়চৌধুরী খুন হবে। ক্লিয়ার? বুঝলেন তো? আপনাদের ভালর জন্যই রাজা রায়চৌধুরীকে দূরে রাখুন। ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্ত।''

ফোন বন্ধ হয়ে গেল!

৪

জয়ন্তী কাঁদতে শুরু করলেন।

রিনি বলল, ''মা, তুমি ঠিক দশ মিনিট কাঁদতে পারো। তারপর আর কাঁদবে না। বাবার সামনে একদম কান্নাকাটি করবে না।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''এখন কান্নাকাটি করলে আমরা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারব না।''

স্নিগ্ধা বলল, ''এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। বিল্টু! তাকে অন্য লোক ধরে রেখেছে! খবরের কাগজে এরকম ঘটনা প্রায়ই পড়ি, কিন্তু আমাদের বাড়িতে...''

সিদ্ধার্থ বলল, ''লোকটায় কী আস্পর্ধা! বলে কিনা ব্যাবসার ব্যাপার! আগে ছিল ছেলেধরা, রাস্তা থেকে ছোট ছেলেদের ধরে নিয়ে পালাত। তারপর শুরু হল অ্যাবডাকশন।''

রিনি বলল, ''অপহরণ আর মুক্তিপণ।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''আর এখন একেবারে খোলাখুলি ছেলে বিক্রির ব্যাবসা! আগে বাবা-মায়ের কাছে টাকা চাইবে, বাবা-মা টাকা দিতে না পারলে বাইরে বিক্রি করে দেবে!''

স্নিগ্ধা বলল, ''পুলিশ কিছুই করতে পারে না?''

সিদ্ধার্থ বলল, ''ওই যে পুলিশে খবর দিলেই মেরে ফেলার ভয় দেখায়। সেই ভয়েই বাবা-মায়েরা পুলিশের কাছে যায় না।''

স্নিগ্ধা বলল, ''দু'-একটা বাচ্চাকে তো সত্যি সত্যি মেরেও ফেলে। কাগজে যে বেরোল, গত সপ্তাহেই সোনারপুরে...''

রিনি বলল, ''আঃ দিদি, ওসব কথা এখন ছাড়ো...'' সে মায়ের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল।

জয়ন্তী কান্না থামিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বললেন, ''কুড়ি লাখ টাকা আমরা কোথায় পাব? অত টাকা। দিতে না পারলে...আমার সব গয়না বিক্রি করে দেব, তাতে কত টাকা হবে?''

স্নিগ্ধা বলল, ''আমার গয়নাও সব বিক্রি করে দেব মা।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''গয়না বিক্রি করেও হবে না। আরও অনেক টাকা লাগবে।''

রিনি বলল, ''এখন তো বাবাকে ফোন করতেই হয়।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''হ্যাঁ কর। তবে সবটা বলার দরকার নেই। শুধু জিজ্ঞেস কর, উনি কখন ফিরবেন। আর বলতে পারিস, মায়ের একটু শরীর খারাপ হয়েছে। কিংবা বলতে পারিস, আমরা এসেছি।''

ফোন করতেই অমিতাভ বললেন, ''এই তো আমি বেরোচ্ছি। আমার কাজ হয়ে গিয়েছে। কিছু খাবারটাবার নিয়ে আসব। বিল্টু চাইনিজ় খেতে চেয়েছিল।''

রিনি বলল, ''না, বাবা, খাবার আনতে হবে না। আজ বাড়িতে অনেক রান্না হয়েছে।''

অমিতাভ জিজ্ঞেস করলেন, ''বিল্টু কী করছে? পড়ছে না ছবি আঁকছে?''

রিনি বলল, ''বিল্টু, ইয়ে এই একটুখানির জন্য পাশের বাড়ি গিয়েছে!''

ফোনটা রেখে দিয়েই রিনি ওড়না দিয়ে চোখ চাপা দিল।

স্নিগ্ধা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ''এবার তুই কাঁদছিস? মনটাকে শক্ত কর।''

ওড়নাটা সরিয়ে রিনি ধরা গলায় বলল, ''বাবার কাছে আমি কখনও মিথ্যে কথা বলি না।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''এক কাজ কর, রিনি। ওই টেপটা চালা তো! কথাগুলো আর-একবার শুনি।''

রেকর্ডিং বেশ পরিষ্কার হয়েছে। টেলিফোনের লোকটার গলা স্পষ্ট বোঝা যায়।

সবটা শোনার পর সিদ্ধার্থ ভুরু কুঁচকে বলল, ''জানিস রিনি, লোকটা যখন এইসব ভয় দেখাচ্ছে, তখন আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এখনই কাকাবাবুকে খবর দিতে হবে। কাকাবাবু ঠিক একটা কিছু উপায় বের করবেন। তখনই লোকটা যেন ঠিক আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই বলল, 'রাজা রায়চৌধুরীকে খবর দেওয়া চলবে না!' ভাব তো ব্যাপারটা, এরকম একটা কাণ্ড হচ্ছে, অথচ কাকাবাবুর সঙ্গে আলোচনাও করতে পারব না?''

রিনি বলল, ''আমরা কাকাবাবুকে কোনও খবর দেব না। কিন্তু উনি নিজেই যদি জেনে যান!''

স্নিগ্ধা জিজ্ঞেস করল, ''নিজে থেকে কী করে জেনে যাবেন?''

রিনি বলল, ''সন্তু এ পাড়ায় প্রায়ই আসে। ওর বন্ধু জোজোর বাড়ি তো পাশের রাস্তায়। যদি কালই এসে পড়ে সন্তু? জোজোকে সঙ্গে নিয়েও আসতে পারে। তখন নিশ্চয়ই বিল্টুকে দেখতে চাইবে! কাল শনিবার, বিল্টুর স্কুল ছুটি। তখন সন্তুকে আমরা কী বলব?''

সিদ্ধার্থ বলল, ''সন্তু বুদ্ধিমান ছেলে। আমাদের ব্যবহার দেখেই বুঝে যাবে যে, কিছু গন্ডগোল হয়েছে।''

রিনি বলল, ''প্রাইজ় নিতে বিল্টুর দিল্লি যাওয়ার কথা। কাকাবাবু বলেছিলেন, তিনিও ঠিক ওই সময় কী-একটা কাজে দিল্লি যাবেন। কাকাবাবু বিল্টুর সঙ্গে একই প্লেনে যেতে চান।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''সন্তু বুঝে যাক কিংবা কাকাবাবু জেনে যান, যাই-ই হোক, তখন কাকাবাবুকে স্পষ্ট বলে দিতে হবে, তিনি যেন কোনওক্রমেই এর মধ্যে মাথা না গলান। আগে বিল্টুকে ফিরিয়ে আনতে হবে।''

জয়ন্তী বললেন, ''স্কুল থেকে ফিরলেই বিল্টুর খিদে পায়। আজ এখনও কিছু খায়নি।''

রিনি বলল, ''ওরা নিশ্চয়ই খেতে দিয়েছে।''

জয়ন্তী এবার রক্তচক্ষে বললেন, ''ওরা খেতে দেবে? ওরা অমানুষ! শয়তান! একটা ছোট ছেলেকে তার মা'র কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যায়!''

এবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল।

অমিতাভ উপরে এসে দেখলেন, বসার ঘরের মেঝেতে সকলে বসে আছে। সকলে একসঙ্গে তাকাল তাঁর দিকে।

কোটটা খুলতে খুলতে অমিতাভ বললেন, ''খুব আড্ডা হচ্ছে বুঝি তোমাদের? বিল্টু এখনও ফেরেনি পাশের বাড়ি থেকে?''

সিদ্ধার্থ অমিতাভকে 'স্যার' বলে ডাকে। কারণ, অমিতাভ একসময় সিদ্ধার্থদের কলেজে পড়াতেন। সিদ্ধার্থ বলল, ''স্যার, আপনি আগে বসুন। আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে। আপনি কি চা খাবেন?''

অমিতাভ ভুরু কুঁচকে বললেন, ''না, চা খাব না। জরুরি কথা? কী বলো তো?''

রিনি তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল এনে দিল বাবার হাতে।

সিদ্ধার্থ বলল, ''আমার কিছু টাকা দরকার।''

অমিতাভ আবার বললেন, ''টাকার দরকার? কেন ব্যাবসা ট্যাবসা করবে নাকি? কত টাকা?''

সিদ্ধার্থ বলল, ''বেশ কিছু টাকা। অন্তত কুড়ি লাখ!''

অমিতাভ এবার হেসে ফেললেন। জলের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, ''তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? কুড়ি লাখ টাকা তো আমাকে বিক্রি করলেও পাওয়া যাবে না! গতমাসেই বাড়িটা সারালাম, হাতে প্রায় কিছুই নেই। বড়জোর এক-দেড় লাখ টাকা দিতে পারি।''

রিনি বলল, ''বাবা, কুড়ি লাখ টাকা জোগাড় করতেই হবে।''

এবার অমিতাভ বেশ অবাক হলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে রিনির দিকে তাকিয়ে বললেন, ''তুই আবার টাকার কথা কী বলছিস? কী ব্যাপার বল তো!''

রিনি বলল, ''বাবা, আমি একটা টেপ শোনাচ্ছি। আগে মন দিয়ে শোনো।''

সে টেপটা চালিয়ে দিল।

অমিতাভ একটুখানি শুনেই বললেন, ''এটা কী? কোনও নাটক নাকি? এটা এখন শুনতে হবে কেন?''

সিদ্ধার্থ বলল, ''স্যার, একটু শুনুন প্লিজ়। প্লিজ়।''

এবার শুনতে শুনতে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। টেপটা শেষ হতেই তিনি গর্জন করে বলে উঠলেন, ''কী, বিল্টুকে এরা ধরে রেখেছে? এরা কোন রাস্কেলের দল? আমি এখনই পুলিশ কমিশনারকে ফোন করব। পুলিশ দিয়েই ওদের শায়েস্তা করতে হবে।''

জয়ন্তী বললেন, ''না, না, আগে পুলিশ না, পুলিশ না। আগে বিল্টুকে বাঁচাতে হবে। তারপর ওদের শাস্তি। এখন যেমন করে হোক, টাকা জোগাড় করতেই হবে।''

অমিতাভ খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সকলের মুখের দিকে তাকাতে

লাগলেন। আপন মনে বললেন, ''অত টাকা...বিল্টু...এখন আমি কী করব?''

এক মিনিট সকলে চুপ।

তারপর জয়ন্তী বললেন, ''আমাদের সব গয়না বিক্রি করে দেব। তা ছাড়া ব্যাঙ্কে যা আছে, অফিস থেকে যা পাও, আর বাকিটা ধার করতে হবে।''

অমিতাভ বললেন, ''কে টাকা ধার দেবে?''

সিদ্ধার্থ বলল, ''অনেক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা ধার পাওয়া যায় শুনেছি।''

অমিতাভ রিনিকে বললেন, ''কাগজ-কলম নিয়ে আয়, হিসেব করে দেখি।''

এই সময় ফোন বেজে উঠল।

স্নিগ্ধা ফোনটা ধরেই বলল, ''হ্যালো।'' তারপরই বলল, ''আপনি এক মিনিট ধরুন,'' ফোনে হাত চাপা দিয়ে সে ফিসফিস করে বলল, ''কাকাবাবু! কাকাবাবু!''

সকলে পাথরের মূর্তির মতো চুপ করে চেয়ে রইল!

কাকাবাবু নিজে থেকে সাধারণত ফোন করেন না। কখনও তাঁর ফোন এলে সকলেরই কত আনন্দ হয়। আজ ভয় হচ্ছে।

সিদ্ধার্থ বলল, ''কথা বলো। কতক্ষণ ধরে থাকবেন উনি, কিছু একটা বলে দাও!''

স্নিগ্ধার কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে রিনি বলল, ''হ্যালো কাকাবাবু, কেমন আছ তুমি?''

কাকাবাবু বললেন, ''ভাল আছি। ফোনটা কে ধরেছিল রে?''

রিনি বলল, ''আমার দিদি। তোমার গলা চিনতে পারেনি।''

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''বিল্টু কোথায় রে? আমি একটু ওর সঙ্গে কথা বলব।''

রিনি বলল, ''বিল্টু? ইয়ে, ও তো পাশের বাড়িতে...ওকে ডাকতে পাঠিয়েছি। কখন আসবে কে জানে!''

কাকাবাবু বললেন, ''ও তো দেখছি পাশের বাড়িতেই বেশি সময় থাকে!''

রিনি বলল, ''পাশের বাড়ির একটি মেয়ে তো বিল্টুর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। সে-ও ছবি আঁকে। বিল্টু তাই...''

কাকাবাবু বললেন, ''বিল্টুর দিল্লি যাওয়া কবে ঠিক হল?''

রিনি বলল, ''এখনও দিন ঠিক হয়নি। খুব সম্ভবত সামনের সপ্তাহে, দিল্লি থেকে টিকিট পাঠাবে।''

কাকাবাবু বললেন, ''তারিখটা আমার জানা দরকার। আমিও সেদিন দিল্লি যাব। আর শোন, বিল্টুকে আমি একটা মাউথ অর্গান উপহার দেব বলেছিলাম। সেটা আমি কিনে ফেলেছি। সেটা আমি বিল্টুকে নিজের হাতে দিতে চাই। কাল সকালে আমি বেরোব, কাল আমি তোদের বাড়ি যাব।''

রিনি চেঁচিয়ে বলে উঠল, ''কাল সকালে? না, না, কাকাবাবু, কাল সকালে এসো না।''

ঘরের সকলে একেবারে চুপ, যেন নিশ্বাস ফেলতেও ভুলে গিয়েছে। সকলে তাকিয়ে আছে ফোনটার দিকে।

কাকাবাবু কিছু বলার আগেই রিনি গলার আওয়াজ বদলে ফেলে বলল, ''মানে, কাকাবাবু বলছি কী, কাল সকালবেলা আমরা সকলে মিলে চিড়িয়াখানায় যাচ্ছি তো, তাই তোমাকে আসতে বারণ করলাম।''

কাকাবাবু বললেন, ''ঠিক আছে, বিকেলবেলা যাব।''

রিনি বলল, ''বিকেলবেলা, মানে, দুপুরে তো দিদির বাড়ি নেমন্তন্ন, কখন ফিরব ঠিক নেই। আমি তোমাকে ফোন করব।''

কাকাবাবু কী বুঝলেন, কে জানে! আর কিছু না বলে ফোন রেখে দিলেন।

রিনি দু'হাত জোড় করে বলল, ''কাকাবাবু, আমাকে ক্ষমা করো। এত মিথ্যে কথা আমি জীবনে বলিনি। কিন্তু...

তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে!

৫

চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে, বিল্টু বাড়িতে নেই। এরকম আগে কখনও হয়নি। কাল রাত থেকে এ বাড়ির কেউ কিছু খায়নি, কেউ শুতেও যায়নি। শুধু শেষ রাতে বসে বসেই ঘুমে চোখ ঢুলে এসেছিল।

পুলিশে খবর দেওয়ার কোনও উপায় নেই। অন্য কাউকে কিছু জানানো চলবে না। পাশের বাড়ির মেয়ে দুটিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বিল্টুর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। সে আছে তার মামাবাড়িতে।

রান্না করে দেওয়ার জন্য এক রান্নামাসি আসে রোজ সকালে। আজ তাকে ছুটি করে দেওয়া হয়েছে। কখন কোন কথা সে শুনে ফেলবে, তারপর বাইরে গিয়ে বলে দেবে, তাই দরকার নেই। সেইজন্য রান্নাও বন্ধ। বাড়িতে পাউরুটি আছে, ফ্রিজে আছে ডাল। দুপুরের দিকে স্নিগ্ধা ডাল গরম করে এনে সকলকে জোর করে একটু একটু খাওয়াল। অমিতাভ আর সিদ্ধার্থ অনবরত আলোচনা করে যাচ্ছে, কোথা থেকে টাকা জোগাড় করা যাবে। টাকা দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

মাঝে মাঝেই ফোন বেজে উঠছে। প্রতিদিনই তো কত ফোন আসে। আজ ফোন বাজলেই সকলে প্রথমে ভয়ে কেঁপে উঠছে! ওরা আবার কী বলবে কে জানে!

এ পর্যন্ত সবই অন্য লোকদের ফোন। কারও সঙ্গেই বেশি কথা বলা হচ্ছে না।

রিঙ্কুমাসি প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা জয়ন্তীর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেন, অন্তত চল্লিশ মিনিট। আজ জয়ন্তী দু'-চারটি কথা বলেই বললেন, "দিদি, আজ আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। তোমাকে আমি পরে ফোন করব। হ্যাঁ, আমরা সকলে ভাল আছি।"

ফোনটা খালি রাখতে হবে। কখন ওদের ফোন আসবে ঠিক নেই।

সেই ফোন এল সন্ধেবেলা। গম্ভীর গলা শুনেই সিদ্ধার্থ ফোনটা দিয়ে দিল অমিতাভকে।

গম্ভীর গলা জিজ্ঞেস করল, "কে কথা বলছেন?"

অমিতাভ বললেন, "আমি বিল্টুর বাবা।"

লোকটি বলল, "গুড! হেড অফ দ্য ফ্যামিলির সঙ্গে কথা বলা দরকার। টাকার কথাটা আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই।"

অমিতাভ বললেন, "আগে বলুন, আমার ছেলে কেমন আছে?"

লোকটা বলল, "কী যেন নাম ছেলেটার? গেরুয়া ধ্বজা?"

অমিতাভ বললেন, "নীলধ্বজ।"

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, "এত শক্ত নাম রাখেন কেন?"

অমিতাভ বললেন, "ওর একটা ডাকনামও আছে।"

লোকটি বলল, "যতবার ওকে জিজ্ঞেস করি, তোর ডাকনাম কী, ততবার বলে কুশগাজি!"

অমিতাভ বললেন, ‘‘কুশগাজি? সে আবার কী, ওর নাম নীলধ্বজ। অচেনা লোক ওর ডাকনাম ধরে ডাকলেও ও উত্তর দেয় না। কাল থেকে ও কিছু খেয়েছে?’’

লোকটি বলল, ‘‘টোস্ট খেয়েছে। আলুভাজা খেয়েছে। একটা চকোলেট দেওয়া হয়েছিল, সেটা খায়নি, নিতেই চায়নি।’’

অমিতাভ জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘রাতে ঘুমিয়েছে?’’

লোকটি আবার ধমক দিয়ে বলল, ‘‘ঘুমোবে না কেন? সব ছোট ছেলেই রাত্তিরে ঘুমোয়। একবারও কান্নাকাটি করেনি।’’

অমিতাভ বললেন, ‘‘ও সহজে কাঁদে না, তা আমরা জানি।’’

লোকটি বলল, ‘‘এসব বাজে কথা থাক। আমার বেশি সময় নেই। এবার কাজের কথা হোক। টাকার জোগাড় হয়েছে?’’

অমিতাভ কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, ‘‘অত টাকা এত তাড়াতাড়ি কী করে জোগাড় করব বলুন তো? আমি তো ব্যবসায়ী নই, একটা মোটামুটি চাকরি করি।’’

লোকটি বলল, ‘‘সকলেই প্রথমে এই কথা বলে। আরে মশাই, টাকা ছাড়া কি পৃথিবী চলে? আপনি কী করেন, তা আমরা ভালই জানি। সব খোঁজ নিয়েছি। লোকে আপনাকে ধার দেবে। শুনুন, ঠিক তিনদিন সময়। টাকা ভরতি সুটকেস নিয়ে একজন মাত্র লোক যাবে। ঠিক ক’টার সময় আর কোথায়, তা পরশুদিন বলে দেব।’’

অমিতাভ জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘মাত্র তিনদিন? তার মধ্যে যদি পুরো টাকাটা জোগাড় করতে না পারি?’’

লোকটি জোরে ধমক দিয়ে বলল, ‘‘আবার ওই কথা? এক পয়সাও কমাব না। আপনার ছেলেকে ফেরত চান কি চান না, বলুন!’’

অমিতাভ অমনই ব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘‘নিশ্চয়ই ফেরত চাই। তার যেন কোনও ক্ষতি না হয়।’’

লোকটি বলল, ‘‘ও ছেলেকে এখনই আরব দেশে বিক্রি করে দিলে অনেক বেশি দাম পাব। উটের দৌড়ের জন্য ওরা ছোট ছেলে চায়। তবে আমরা বাবা-মাকেই প্রথম অফার দিই। সেইজন্যই আর তিনদিন সময় দিয়েছি। দেরি হলে ও ছেলেকে আর জীবনেও দেখতে পাবেন না!’’

অমিতাভ বললেন, ‘‘না, না, না, আমি চেষ্টা করছি।’’

লোকটি বলল, ‘‘তাই করুন। আপনারা পুলিশে খবর দেননি, তা আমরা

জানি। কিন্তু ওই খোঁড়া লোকটা, রাজা রায়চৌধুরী, তাকে খবর দেননি তো?''

অমিতাভ বললেন, ''না, তিনি কিছুই জানেন না।''

লোকটি বলল, ''গুড! ও লোকটার সব কিছুতে মাথা গলানো অভ্যেস। এবার মাথা গলাতে এলে ওর মাথাটাও কেটে ফেলব আর আপনার ছেলেরও! ঠিক আছে, পরশুদিন আবার কথা হবে!''

ফোনটা রেখে দিয়ে অমিতাভ অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''আর মোটে তিনদিন সময় দিয়েছে।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''যেভাবেই হোক টাকাটা জোগাড় করতেই হবে। আপনার মনে নেই, গত বছর একটা কোম্পানির বড়সাহেব একদিন মর্নিংওয়ার্কে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে তাঁকে কয়েকজন কিডন্যাপ করে। ঠিক এইরকমই, পুলিশে খবর দিতে ভয় দেখানো হয়েছিল। ওঁর বাড়ির লোক মোটা টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ভদ্রলোককে উদ্ধার করেন। তারপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ কয়েকজনকে ধরেছে, কিছু টাকাও ফেরত পাওয়া গিয়েছে। আমাদেরও সেরকম করতে হবে।''

অমিতাভ হতাশভাবে বললেন, ''আগে টাকা চাই! অত টাকা!''

রিনি বলল, ''একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। ডাক্তার সুপ্রিয় রায় নামে আগে যে একজন ফোন করেছিল, বিল্টুকে একটু পরেই ফেরত দেওয়ার কথা বলেছিল, সে কোথায় গেল?''

জয়ন্তী বললেন, ''সে ধাপ্পা দিয়েছে!''

রিনি বলল, ''কিন্তু সে বিল্টুর কথা জানে। কোন স্কুলে পড়ে তাও জানে।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''সে লোকটাও ওদেরই দলের। তোমাকে ফোন করে ওই কথা বলেছিল কেন জানো? যাতে তোমরা আগেই পুলিশে খবর না দাও! ততক্ষণে বিল্টুকে ওরা অনেক দূরে সরিয়ে ফেলেছে।''

অমিতাভ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ''বদমাইশের দল! আমি এখন বেরোচ্ছি। দেখি, কোথায় কোথায় টাকা পাওয়া যায়!''

৬

জোজো দোতলায় উঠে এসে দেখল, কাকাবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ। সে বাইরে থেকে দু'বার ডাকল, ''কাকাবাবু, কাকাবাবু!''

কোনও উত্তর নেই।

সে আবার বলল, ''কাকাবাবু, আমি জোজো।''

তাও কোনও উত্তর নেই!

জোজো আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, ''কাকাবাবু, আপনি ব্যস্ত আছেন?''

এবারে ভিতর থেকে শোনা গেল কাকাবাবুর গলা। তিনি বললেন, ''না, ব্যস্ত নেই। কিন্তু দরজা খুলতে ইচ্ছে করছে না। তুমি পরে এসো।''

জোজো অবাক হয়ে কয়েকবার চোখ পিটপিট করল। তারপর পা টিপে টপে উঠে গেল উপরে।

বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে বুকের উপর বই রেখে পড়ছে সন্তু আর একটা গান বাজছে মিউজ়িক সিস্টেমে।

জোজো ঘরে ঢুকে বলল, ''ব্যাড হ্যাবিট, ব্যাড হ্যাবিট। শুয়ে শুয়ে বই পড়া মোটেই ভাল নয়। তা হলে আর চেয়ার-টেবিল বানানো হয়েছে কেন?''

সন্তু বলল, ''তুই যে বিছানায় বসে বসে ব্রেকফাস্ট খাস? তা হলে খাওয়ার টেবিল থাকে কেন বাড়িতে?''

জোজো বলল, ''ওটা হচ্ছে রোমান স্টাইল। রোমের বড় বড় লোকেরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে খেত আর বিরাট বিরাট ঢেকুর তুলত। আমার অবশ্য ঢেকুর ওঠে না।''

সন্তু বলল, ''রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুয়ে শুয়ে লিখতেন আর পড়তেন।''

জোজো জিজ্ঞেস করল, ''তুই বুঝি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শুয়ে শুয়ে পড়তে দেখেছিস?''

সন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলল, ''তুই বুঝি সেকালের রোমের লোকদের শুয়ে শুয়ে খেতে দেখেছিস?''

জোজো বলল, ''হ্যাঁ দেখেছি, সিনেমায়!''

সন্তু উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, ''তুই আমার শরদিন্দু গ্রন্থাবলিটা ফেরত এনেছিস?''

জোজো বলল, ''এখনও শেষ হয়নি। আস্তে আস্তে পড়ছি।''

সন্তু বলল, ''তোর কাছে আমার অনেক বই জমে যাচ্ছে, জোজো।''

জোজো বলল, ''আমি একসঙ্গে তিন-চারটে বই পড়ি। একবার এ বইয়ের দু'পাতা, আবার বিকেলে আর-একটা বইয়ের তিন পাতা...'' হঠাৎ কথা থামিয়ে জোজো সন্তুর দিকে একটুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, ''কাকাবাবুর কী হয়েছে রে সন্তু?''

সন্তু বলল, ''কেন, তুই কী দেখলি?''

জোজো বলল, ''দরজা বন্ধ। এই সময় কোনওদিনও তো দরজা বন্ধ থাকে না। আমাকে দেখলেই জিজ্ঞেস করেন, 'নতুন খবর কী জোজোসাহেব? আজ আমি ডাকলাম, তবু দরজা খুললেন না!' ''

সন্তু বলল, ''আজ কাকাবাবুকে ডিস্টার্ব করা চলবে না। ওঁর খুব মনখারাপ। আমাদের বাড়িসুদ্ধ সকলেরই মনখারাপ। কাকাবাবু কারও সঙ্গে কথাই বলতে চাইছেন না।''

জোজো ভুরু কুঁচকে বলল, ''বাড়িসুদ্ধ সকলেরই মনখারাপ? কেন রে? কী হয়েছে?''

সন্তু বলল, সেটা আর কাউকে জানানো নিষেধ। তোকে বললে তো তুই দুনিয়াসুদ্ধ লোককে জানিয়ে দিবি।''

জোজো বলল, ''আই প্রমিস।''

সন্তু বলল, ''তুই বিল্টুকে চিনিস তো? আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসে।''

জোজো বলল, ''বিল্টুকে চিনব না কেন? ও তো ছবি এঁকে একটা দারুণ প্রাইজ় পেয়েছে। কী হয়েছে বিল্টুর?''

সন্তু বলল, ''বিল্টুকে পাওয়া যাচ্ছে না। মানে, তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। সাংঘাতিক একদল লোক কুড়ি লাখ টাকা চেয়েছে। টাকাটা ঠিক সময় না পেলে...''

জোজো বলল, ''এই ব্যাপার? এ জন্য কাকাবাবু শুধু শুধু মনখারাপ করবেন কেন? তিনি তো ইচ্ছে করলেই লোকগুলোকে ধরে ফেলতে পারেন।''

সন্তু বলল, ''না, শোন। আজ ভোরবেলা সিদ্ধার্থদা ফোন করেছিলেন। আমাকে বললেন, খবরটা জানাননি বলে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু লোকগুলো শর্ত দিয়েছে, পুলিশে খবর দেওয়া চলবে না। আর কাকাবাবুকে কিছুতেই এর মধ্যে জড়ানো যাবে না। এমনকী কাকাবাবু এখন বিল্টুদের বাড়িতে যেতেও

পারবেন না। কাকাবাবু কিছু করতে গেলেই ওরা বিল্টুকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছে। সিদ্ধার্থদা আমাকে বললেন, কাকাবাবুকে এইসব কথা বুঝিয়ে বলতে। ওঁরা টাকা দিয়েই বিল্টুকে ছাড়িয়ে আনতে চান। এইসব কথা শুনেই কাকাবাবু কেমন যেন হয়ে গেলেন। একটা কথাও বললেন না। তারপর... জোজো, তুই কখনও কাকাবাবুকে কাঁদতে দেখেছিস?''

জোজো বলল, ''কোনওদিন না। কাকাবাবু কেঁদেছেন?''

সন্তু বলল, ''প্রথমে চোখ দিয়ে জল নেমে এল। তারপর কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। একটু পরে সেই যে দরজা বন্ধ করলেন, আর কারও ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না! কাকাবাবু বিল্টুকে খুব ভালবাসেন।''

জোজো বলল, ''কাকাবাবু সব ছোট ছেলেমেয়েদেরই ভালবাসেন। ছোটদের কষ্ট উনি সহ্য করতে পারেন না। এখন কী হবে?''

সন্তু বলল, ''সিদ্ধার্থদা বলেছেন, আগে যেভাবেই হোক বিল্টুকে উদ্ধার করতে হবে। তারপর ওদের শাস্তির ব্যবস্থা।''

জোজো বলল, ''ইস, আমার বাবা এখন এখানে নেই। তিব্বতে গিয়েছেন বিশেষ কাজে।''

সন্তু বলল, ''তোর বাবা থাকলে কী হত?''

জোজো বলল, ''বাবা কার্লোসকে বলে দিতেন। কার্লোস এক ধমক দিলেই ওরা সুড়সুড় করে এসে বিল্টুকে ফেরত দিয়ে যেত।''

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ''কার্লোস কে?''

জোজো বলল, ''তুই কার্লোসের নাম শুনিসনি? পৃথিবীতে যত কিডন্যাপিং-এর দল আছে, কার্লোস হচ্ছে তাদের হেড। তাকে সকলে ভয় পায়। সে যে কোন দেশের লোক, কী জাত, তা কেউ জানে না। সে আঠাশ রকম ছদ্মবেশ ধরতে পারে! আঠাশ রকম ভাষাও জানে! তার মধ্যে বাংলাও বলে ঝরঝর করে!''

সন্তু আবার তাকে জিজ্ঞেস করল, ''তোর বাবা তাকে চিনলেন কী করে?''

জোজো বলল, ''এইসব লোকের একটা কিছু দুর্বলতা থাকে। এমনিতে লোকটা দারুণ সাহসী, সাতবার মিলিটারির হাতে ধরা পড়েও পালিয়েছে। দু'হাতে রিভলভার চালাতে পারে। এমন লোকও ঘুমোলেই খুব ভয়ের স্বপ্ন দ্যাখে! দারুণ ভয়ের স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে। তারপরই ঘুম ভেঙে যায় আর ঘুমোতে পারে না। জেগে বসে থাকে। অনেক

চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই এই ঘুমের মধ্যে ভয় পাওয়ার অসুখ সারেনি, বুঝলি? তারপর কার্লোস একবার কলকাতা এসে আমার বাবার নাম শুনে দেখা করতে আসে। না, ভুল বললাম, আমার বাবার নাম আগেই শুনে তারপর কলকাতায় এসেছিল। বাবা তাকে বিশল্যকরণী গাছের কয়েকটা শিকড় রোজ চিবিয়ে খেতে বলেন। তাতে কী হয় বল তো? অনেক স্বপ্ন দেখা যায়! অনেক স্বপ্ন আর ভাল ভাল স্বপ্ন। তাই ভয়ের স্বপ্ন আর পাত্তা পায় না। ভাল স্বপ্নগুলো গুঁতোগুঁতি করে খারাপ স্বপ্নটাকে তাড়িয়ে দেয়। আর কার্লোস আরাম করে ঘুমোয়। ইস, কার্লোসকে একটা খবর দিতে পারলে কত ভাল হত। ও কলকাতায় সব গুন্ডা-বদমাইশদের চেনে। ও বাবাকে কথা দিয়েছে, বাঙালিদের কখনও ক্ষতি করবে না।''

সন্তু বলল, ''তোর কাছে কার্লোসের কথা এই প্রথম শুনলাম।''

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, ''এরকম আরও কত আছে! শুনবি আস্তে আস্তে। এখন কথা হচ্ছে, কাকাবাবু মাথা না গলালেও বিল্টুকে উদ্ধার করার জন্য তুই আর আমি কিছু করতে পারি না?''

সন্তু বলল, ''কী করতে পারি বল? এক তো, কার্লোসকে পাওয়া গেল না।''

জোজো বলল, ''দাঁড়া, একটু ভেবে দেখি।''

তখনই বুলবুলিপিসি এসে ঢুকলেন ঘরে। চিন্তিতভাবে বললেন, ''এ কী ব্যাপার হচ্ছে রে সন্তু? ছোড়দা যে কিছুতেই দরজা খুলছেন না। ব্রেকফাস্ট খেলেন না, কফি খেলেন না, শরীরটরির খারাপ হল নাকি?''

সন্তু বলল, ''শরীর খারাপ নয়, মনখারাপ।''

বুলবুলিপিসি বললেন, ''তা তো জানি। কিন্তু মনখারাপ থেকেই শরীর খারাপ হয়। কিছু না খেলে চলে? সন্তু, একটা কিছু ব্যবস্থা কর।''

সন্তু খানিকটা অসহায়ভাবে বলল, ''আমি কী করব বলো তো পিসি?''

বুলবুলিপিসি বললেন, ''তুই গিয়ে ডাক। তোর কথা শুনবেন। দরজা খুলবেন।''

সন্তু বলল, ''তোমরা কাকাবাবুকে সব সময় হেসে হেসে কথা বলতে দ্যাখো। ওঁর রাগ তো দ্যাখোনি। ওরে বাবা, ওঁর রাগের সময় আমিও সামনে দাঁড়াতে ভয় পাই।''

জোজো বলল, ''আমি একটা কথা বলব? চলো, সকলে মিলে একসঙ্গে যাই। তিনজন একসঙ্গে ডাকব। তা হলে কাকাবাবু ঠিক দরজা খুলতে বাধ্য

হবেন। আমি একেবারে সামনে দাঁড়াব। যদি আমার উপর বেশি রাগ করেন, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না। আমি ফটাস করে হেসে দেব।''

বুলবুলিপিসি বললেন, ''ফটাস করে হাসি মানে? সেটা আবার কেমন?''

জোজো বলল, ''আছে, আছে, দেখলে বুঝবে।''

তিনজনই নেমে এল নীচে।

কাকাবাবুর বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনজনেই একসঙ্গে ডাকল, ''কাকাবাবু! ছোড়দা!''

কোনও উত্তর নেই।

সন্তু এবার জোজোর কানে কানে কী যেন বলে দিল।

জোজো চেঁচিয়ে বলল, ''কাকাবাবু, তুমি যদি দু'মিনিটের মধ্যে দরজা না খোলো, তা হলে তোমার দাদা পায়ের ব্যথা নিয়েও উপরে উঠে আসবেন বলেছেন।''

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল!

কাকাবাবুর ভুরু কোঁচকানো গম্ভীর মুখ দেখে সন্তু সরে গেল পিছনে।

কাকাবাবু বললেন, ''আঃ, তোমরা কেন আমাকে বিরক্ত করছ?''

জোজো বলল, ''সকলে ভিতরে চলে এসো, ভিতরে চলে এসো।''

জোজো প্রথমে কাকাবাবুকে প্রায় ঠেলেই ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। সন্তুরও হাত ধরে টেনে আনল।

বুলবুলিপিসি নিজেই ভিতরে এসে জোজোর দিকে তাকালেন।

জোজো বলল, ''এখনও ফটাস হাসির সময় হয়নি। এখনও কাকাবাবু আলাদা করে আমাকে বকেননি।''

কাকাবাবু বুলবুলিপিসির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,'' কী ব্যাপার তোমাদের?''

বুলবুলিপিসি বললেন, ''বিল্টুর জন্য আমাদের সকলেরই খুব মনখারাপ। কিন্তু সকাল থেকে উপোস করে থাকলে কি কোনও লাভ হবে? ছোড়দা, তুমি কফিও খাওনি!''

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ''শুধু মনখারাপ নয় রে বুলবুল। এখন অসহ্য রাগে আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছে, রিভলভারটা নিয়ে এখনই বেরিয়ে গিয়ে ওদের গুলি করে মেরে ফেলি!''

বুলবুলিপিসি জিজ্ঞেস করলেন, ''ওদের মানে কাদের?''

কাকাবাবু বললেন, ''যারা বিল্টুর মতো ছোট ছেলেদের চুরি করে নিয়ে যায়। মেরে ফেলার ভয় দেখায়, তাদের!''

বুলবুলিপিসি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ''তাদের তুমি পাবে কোথায়?''

কাকাবাবু বললেন, ''তাদের যে আমি খুঁজে বের করব, তারও তো উপায় নেই। বিল্টুর বাবা-মা তা চায় না। আমি কিছু না করে ঘরের মধ্যে বসে থাকব? ওঃ, অসহ্য! অসহ্য!''

জোজো বলল, ''কাকাবাবু, আপনি সত্যি সত্যি তাদের দেখতে পেলেও গুলি করে মেরে ফেলতে পারবেন? আপনি তো কাউকেই শেষ পর্যন্ত মারেন না।''

কাকাবাবু বললেন, ''আগে পারতাম না। অনেক অপরাধীকেই শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করে দিয়েছি। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে, তাদের মতো খারাপ মানুষ আর হয় না। তারা মানুষ নয়, অমানুষ। তাদের একেবারে মেরে ফেলাই উচিত।''

কাকাবাবুর পিঠে হাত রেখে বুলবুলিপিসি বললেন, ''ছোড়দা, রাগে তোমার শরীর কাঁপছে। একটু শান্ত হও! বসো, আমি তোমার ব্রেকফাস্ট এনে দিচ্ছি।''

কাকাবাবু ইজিচেয়ারে বসে পড়ে চোখের সামনে খবরের কাগজ তুলে নিলেন।

সন্তু ফিসফিস করে জোজোকে বলল, ''চল, আমরা উপরে যাই!''

টোস্ট, অমলেট আর কফি খাওয়ার পর কাকাবাবু বাইরে বেরোনোর পোশাক পরে নেমে এলেন নীচে।

বুলবুলিপিসি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''ছোড়দা, তুমি বেরোচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ?''

কাকাবাবু ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দিলেন, ''কোথায় যাচ্ছি মানে? আমি পুলিশের কাছে যাব না, বিল্টুদের বাড়ির দিকেও যেতে পারব না। তা হলে কি আমাকে নিজের বাড়িতে বন্দি হয়ে থাকতে হবে? এই একটু ঘুরে আসছি।''

দরজা খুলে কাকাবাবু বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। বাড়ি থেকে কোথাও যেতে হলে তিনি সাধারণত ট্যাক্সি নেন। বাসের ভিড়ে তাঁর অসুবিধে হয়। আজ ট্যাক্সি না ডেকে খানিকটা হেঁটে এলেন পার্কের কাছে। একটু দাঁড়াতেই সেখানে একটা দোতলা বাস এসে থামল।

এখন বেলা সাড়ে এগারোটা। তবু বাসে বেশ ভিড়। কাকাবাবু ক্রাচদুটো নিয়ে সাবধানে বাসে উঠলেন। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন বাসের হাতল ধরে।

কিছু দূর গিয়ে বাস বদল করে আর-একটা বাসে উঠলেন কাকাবাবু। তারপর নামলেন খিদিরপুরের কাছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুঝতে চাইলেন, কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে কিনা। কেউ নেই। খানিকটা হেঁটে একটা গলির মুখে এসে তিনি একটা বাড়ির গেটের কাছে থামলেন। বেশ উঁচু লোহার গেট, ভিতরে মোরাম ঢালা একটু রাস্তা, তারপর শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। বাড়িটি বেশ বড় আর পুরনো আমলের। এক পাশ দিয়ে দেখা যায় গঙ্গা নদী।

গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বেশ লম্বা চেহারার, পাগড়িপরা দরোয়ান। কাকাবাবু শার্টের পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দরোয়ানকে দিয়ে বললেন, "আমি জগৎ মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। এই কার্ডে আমার নাম লেখা আছে।"

দরোয়ান গেট না খুলে কার্ডটা নিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এল সঙ্গে আর-একজন লোক নিয়ে।

ধুতির উপর সাদা শার্ট পরা সেই লোকটি কাছে এসে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি সত্যিই রাজা রায়চৌধুরী? মল্লিকবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?"

কাকাবাবু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "সত্যি না তো মিথ্যে হবে কেন? হ্যাঁ, আমিই রাজা রায়চৌধুরী। মল্লিকবাবু বাড়িতে আছেন নিশ্চয়ই?"

লোকটি দরোয়ানকে গেট খুলে দেওয়ার ইঙ্গিত করে কাকাবাবুকে বলল, "আসুন।"

একটা মস্ত বড় বসার ঘরে কাকাবাবুকে বসিয়ে লোকটি ভিতরে চলে গেল। কাকাবাবু দেওয়ালের ছবিগুলো দেখতে লাগলেন।

খানিক পরে লোকটি ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, "বাবু আছেন তিনতলার ঘরে। এখন নামতে পারবেন না। আপনি সেখানে যেতে চান?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, যেতে চাই। শুধু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে অসুবিধে হবে, আস্তে আস্তে উঠব।"

বাইরে একটা লম্বা বারান্দা, একপাশে উঠোন। সিঁড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়ে লোকটি বলল, "আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। লিফ্‌ট আছে পাশেই।"

কাকাবাবু বললেন, "এটা নতুন। আগে ছিল না।"

উপরে উঠে এসে কাকাবাবুকে লোকটি নিয়ে এল আর-একটি ঘরে। এটাও একটা বসার ঘর, সোফা দিয়ে সাজানো। জানলা দিয়ে দেখা যায়, গঙ্গা দিয়ে যাচ্ছে স্টিমার। ঘরে কেউ নেই। কাকাবাবুকে বলা হল কোণের দিকে একটা সোফায় বসতে।

কাকাবাবু বসতে যেতেই লোকটি হঠাৎ পিছন থেকে জাপটে ধরল কাকাবাবুকে। তারপর এক হাতে কাকাবাবুর গলাটা পেঁচিয়ে ধরে অন্য হাতটা ঢুকিয়ে দিল তাঁর প্যান্টের পকেটে। কাকাবাবুও চোখের নিমেষে লোকটির সেই হাতটা ধরে এমন জোরে মুচড়ে দিলেন যে লোকটি যন্ত্রণায় 'আঁ আঁ' করে উঠল।

কাকাবাবু লোকটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, ''ছিঃ, অন্য লোকের পকেটে ওরকমভাবে হাত দিতে নেই। আমার রিভলভারটা বের করে নেওয়ার তাল করছিলে তো? সেটা মুখে বললেই হত। পাছে রাগের চোটে কাউকে আজ গুলি করে ফেলি, তাই রিভলভারটা আমি সঙ্গেই আনিনি। এই দ্যাখো!'' কাকাবাবু সব পকেট উলটে দেখালেন।

তখনই একদিকের পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন জগৎ মল্লিক। খুব ফরসা রং, লম্বা-চওড়া চেহারা। পুরুষ্টু গোঁফ আছে, একটু একটু টাক পড়তে শুরু করেছে। কোঁচানো ধুতি আর ফিনফিনে সাদা পাঞ্জাবি পরা।

জগৎ মল্লিক দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন, ''আমি এখনও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না! সত্যি সত্যি রাজা রায়চৌধুরী এসেছেন, নিজের ইচ্ছেতে, এই বাঘের গুহায়?''

কাকাবাবু হেসে বললেন, ''না, না, বাঘের গুহা কেন হবে? এটা আপনার মতো একজন বনেদি মানুষের বাড়ি। এ বাড়িতে তো আমি আগেও এসেছি। তাই না?''

জগৎ মল্লিক বিদ্রূপের সুরে বললেন, ''আপনাকে এখনই যদি মেরে ফেলি, কে আপনাকে বাঁচাতে আসবে? রিভলভারও তো সঙ্গে আনেননি শুনলাম।''

কাকাবাবু বললেন, ''অমনভাবে কি মানুষকে মেরে ফেলা যায়? আপনি বড়জোর চেষ্টা করতে পারেন। চেষ্টা করলেই যে পারবেন, তারও তো কোনও মানে নেই। আমার আবার বেঁচে থাকার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। যাই হোক, বসুন, বসুন, আপনার সঙ্গে কাজের কথা আছে।''

জগৎ মল্লিক ধমক দিয়ে বললেন, ''বাজে কথা ছাড়ুন। আপনার সঙ্গে

আবার কাজের কথা কী! আপনাকে দেখেই রাগে আমার গা জ্বলছে। আপনাকে খুন করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।''

কাকাবাবু বললেন, ''মৃতদেহ হয়ে গঙ্গার জলে ভাসার একটুও ইচ্ছে আমার নেই। এখন আমার কথা শুনুন। তা হলে আপনার রাগ কমে যাবে।''

জগৎ মল্লিক গর্জন করে বললেন, ''রাগ কমবে মানে? আপনার জন্য আমি পাঁচ বছর জেল খেটেছি। ছাড়া পেয়েছি মাত্র সাতদিন আগে। জেলে বসে প্রতিটা দিন আমি ভেবেছি, রাজা রায়চৌধুরীর উপর আমি প্রতিশোধ নেবই নেব। প্রাণে না মারলেও আর-একটা পা খোঁড়া করে দেব।''

কাকাবাবু বললেন, ''সে যখন দেওয়ার তখন দেবেন। আপনি জেল খেটেছেন। দামি দামি সব মূর্তি বিদেশে পাঠাতে গিয়ে ধরা পড়েছেন বলে।''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''আপনি আমাকে আর আমার ভাইকে ধরিয়ে দিয়েছেন।''

কাকাবাবু বললেন, ''ওই সব অসৎ কাজ না করলে ধরা পড়ার কিংবা জেল খাটার প্রশ্নও ছিল না। যাই হোক, মল্লিকবাবু, আপনারা কি কখনও ছোট ছেলেমেয়েদের বিদেশে বিক্রির ব্যাবসা করেছেন? কিংবা ছোট ছেলেমেয়েদের চুরি করে তাদের মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে বাবা-মায়ের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করার কারবার করেছেন?''

রাগে জগৎ মল্লিকের ফরসা মুখখানা লাল হয়ে গেল! আবার তিনি গর্জন করে বলল, ''কী, আমরা ওসব নোংরা কাজ করি? কখনও না। বিদেশ মূর্তি চালান দেওয়া আমাদের অনেক দিনের ব্যাবসা। তার মধ্যে কোনটা চোরাই কিংবা কোনটা পাঠানো বেআইনি তা আমরা জানব কী করে? ছোট ছেলেমেয়ে বিক্রির মতো কুৎসিত কাজ আমরা কখনও করি না।''

কাকাবাবু বললেন, ''আমারও তাই ধারণা। টাকার জন্য আপনারা অত নীচে নামবেন না। কিন্তু কারা ওই সব নোংরা কাজ করে, তাদের নিশ্চয়ই আপনারা চেনেন?''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''ওরকম দু'-একটা দলের কথা জানি বটে।''

কাকাবাবু বললেন, ''একটা ছোট ছেলে, আট-সাড়ে আট বছর বয়স, সে আমার খুবই প্রিয়। ছেলেটি খুবই গুণীও বটে। তাকে ওইরকম একটা দল ধরে নিয়ে গিয়েছে। ছেলেটির কোনও ক্ষতি হলে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। কোন দল ওই ছেলেটিকে ধরে রেখেছে, সে খবর আপনারা

নিশ্চয়ই চেষ্টা করলে জানতে পারবেন। আজকের মধ্যেই সে দলটার নাম আমাকে জানালে আমার খুব উপকার হয়।''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''আপনার উপকার হয়? চেষ্টা করলে খবরটা আমরা জানতে পারি। কিন্তু আপনার সেই উপকার আমরা করব কেন?''

কাকাবাবু বললেন, ''তার বদলে আমিও আপনাদের এমন একটা উপকার করতে পারি।''

এমন সময় কে যেন হুংকার দিয়ে বলে উঠল, ''কই, কই কোথায় সে?'' পরদাটা সরিয়ে ঢুকল আর-একজন লোক। ঠিক থিয়েটারের মতো! লোকটির চেহারা হুবহু জগৎ মল্লিকের মতো। শুধু ধুতি-পাঞ্জাবির বদলে প্যান্ট-শার্ট পরা। বোঝাই যায়, এরা যমজ ভাই। এঁর নাম মাধব মল্লিক।*

মাধব মল্লিকের হাতে একটা ঝকঝকে তলোয়ার! সেই তলোয়ার তুলে তিনি বললেন, ''এই যে, সত্যিই রাজা রায়চৌধুরী। এবার ঘচাং করে ওর মুন্ডুটা এক কোপে কেটে ফেলব!''

কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, ''নমস্কার মাধববাবু। বসুন, কথা আছে।''

মাধব মল্লিক বিকৃত গলায় বললেন, ''কথা? কোনও কথা নেই। এখন আমি রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব! এঁর জন্য আমরা দু'ভাই জেল খেটেছি!''

মাধব মল্লিক খুব কাছে এগিয়ে আসছে দেখে কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। একটা ক্রাচ তুলে নিয়ে আটকালেন মাধব মল্লিকের হাতের উদ্যত তলোয়ার। মাধব মল্লিক আবার মারার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু আটকালেন। এরকম দু'-তিনবারের পরই কাকাবাবু ওর ডান হাতের কবজিতে এত জোরে মারলেন যে তলোয়ারটা খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

কাকাবাবু সেটাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন, ''মাধববাবু, তলোয়ার শুধু হাতে ধরলেই হয় না, ভাল করে চালানো শিখতে হয়। ওসব না শিখে রাজা রায়চৌধুরীকে আক্রমণ করা যায় না। বসুন, এখন কাজের কথা হবে!''

এবার জগৎ মল্লিকও বললেন, ''বোসো মাধব। উনি কী বলছেন, একবার শুনে নিই।''

মাধব মল্লিক ডান হাতটা নাড়তে নাড়তে ফুঁ দিতে লাগলেন।

কাকাবাবু বললেন, ''ছেলেটির নাম বিল্টু। ভাল নাম নীলধ্বজ। তিনদিন

---

*এই দুই যমজ ভাইয়ের কথা আছে 'কলকাতার জঙ্গলে' বইয়ে।

আগে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। কারা তাকে চুরি করেছে, কোথায় তাদের আসল ঘাঁটি, এসব আমার জানা দরকার।''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''ধরুন আপনাকে জানালাম। তার বদলে আপনি আমাদের কী উপকার করবেন?''

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনার ছেলে বিশ্বজিৎ এখন কোথায়?''

জগৎ মল্লিকের মুখখানা একটু যেন ম্লান হয়ে গেল। আস্তে আস্তে তিনি বললেন, ''সে কোথায়, তা তো আমি জানি না।''

কাকাবাবু বললেন, ''সে কোথায়, তা আপনারা ঠিকই জানেন। আমিও জানি। আপনারা তাকে লুকিয়ে রেখেছেন। এত অল্প বয়সে সে লেখাপড়া ছেড়ে বাজে দলের সঙ্গে মিশে একেবারে বখে গিয়েছে। তিনটে পেট্রোল পাম্প ডাকাতির ব্যাপারে সে জড়িত। কোচবিহারের বিখ্যাত মদনমোহন মূর্তি সে চুরি করে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। সেখানকার মন্দিরের এক পুরোহিতের সে তিনখানা দাঁত ভেঙে দিয়েছে। পুলিশ তাকে খুঁজছে হন্যে হয়ে। ঠিক বলছি কিনা?''

দুই ভাই, জগাই-মাধাই চুপ করে রইলেন।

কাকাবাবু বললেন, ''বেশিদিন সে ফেরার হয়ে থাকতে পারবে না। ধরা সে পড়বেই। মাত্র তেইশ বছর বয়স। এই বয়সে সে জেলে গিয়ে পাকা পাকা ক্রিমিনালের সঙ্গে মিশে নিজেও পাকা ক্রিমিনাল হয়ে উঠবে! আপনারা তাই চান?''

জগৎ মল্লিক জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনি কী বলতে চান, খুলে বলুন না।''

কাকাবাবু বললেন, ''আমি তাকে সৎপথে ফেরাতে চাই। জেলে পাঠালে সেটা হবে না। বরং এবারের মতো তাকে ক্ষমা করে দিলে আপনারা চেষ্টা করে তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে পারেন। সেখানে আবার পড়াশোনা শুরু করতে পারবে। অন্যরকম পরিবেশে সে আর অপরাধের পথে যাবে না। আমি ব্যবস্থা করব, যাতে পুলিশ তাকে না ধরে এবারের মতো। শুধু মদনমোহনের মূর্তিটা ফেরত দিলেই তাকে ক্ষমা করা হবে।''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''আপনি সত্যিই সে ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন? আপনি বাঁচাতে পারবেন আমার ছেলেটাকে?''

কাকাবাবু বললেন, ''মানুষকে শাস্তি দেওয়ার বদলে তাকে ভাল পথে ফেরানোর আনন্দই তো বেশি। আমি কথা দিচ্ছি, পুলিশ তাকে এবার ধরবে

না। তবে, আবার যদি সে কোনওরকম কুকাজ করে, তবে তার ডবল শাস্তি হবে, এটাও ঠিক।''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''না, না, তাকে আমরা জার্মানি পাঠিয়ে দেব। আপনার এই কথার উপর নির্ভর করা যায়?''

কাকাবাবু বললেন, ''রাজা রায়চৌধুরী কোনও কথা দিলে তার খেলাপ করে না কখনও। বিশ্বজিৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমার ওই খবরগুলো আজই বিকেলের মধ্যে চাই।''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''আজই বিকেলের মধ্যে পারব কিনা জানি না। কিছুটা সময় তো লাগবেই। কালকের মধ্যে সব জেনে যাব আশা করি।''

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ''একেবারে পাকা খবর চাই। দলের পাণ্ডা কে আর কোথায় তাদের ঘাঁটি?''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''যেমন ভাবেই হোক, সেসব খবর আমি জোগাড় করবই। আমার ছেলেটাকে আপনি বাঁচান।''

কাকাবাবু মাধব মল্লিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''আপনার কবজিতে একটা কিছু মলম লাগান। নইলে কিন্তু ওই জায়গাটা ফুলে যাবে আর খুব ব্যথা হবে।''

৭

গাড়ি ছুটছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে। সন্ধে হয়ে গিয়েছে। গাড়ি চালাচ্ছে সিদ্ধার্থ, পাশে বসে আছেন অমিতাভ। দু'জনেরই মুখে কোনও কথা নেই। অমিতাভর হাতে মোবাইল। মাঝে মাঝেই সেই ফোনে নির্দেশ আসছে।

একটু পরেই আবার ফোন বেজে উঠল।

অমিতাভ 'হ্যালো' বলতেই একটা গম্ভীর কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, ''আপনারা এখন কোথায়?''

অমিতাভ বললেন, ''শক্তিগড়ের কাছাকাছি এসেছি।''

সেই লোকটি বলল, ''সামনে যেখানে ঘোরার জায়গা দেখবেন, সেখান দিয়ে গাড়ি ফেরাবেন। ইউ টার্ন। বাড়ির দিকে ফিরবেন।''

অমিতাভ দারুণ অবাক হয়ে বললেন, ''বাড়িতে ফিরে যাব?''

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, ''আমি সে কথা বলেছি? বাড়ির দিকে, তার মানেই বাড়িতে ফেরা নয়।''

ধমক খেয়েও অমিতাভ বললেন, ''আচ্ছা। বুঝেছি।''

লোকটি বলল, ''টাকা রেডি আছে?''

অমিতাভ বললেন, ''হ্যাঁ।''

লোকটি জিজ্ঞেস করল, ''সব হাজার টাকার নোট?''

অমিতাভ বললেন, ''হ্যাঁ। আমার ছেলে ভাল আছে?''

লোকটি বলল, ''সে ভালই আছে। তবে তার মাথার কাছে একটা রিভলভার ধরা আছে। আপনাদের সঙ্গে পুলিশ দেখলেই গুলি চালাব।''

অমিতাভ ভয় পেয়ে বলে উঠলেন, ''না, না, আমরা পুলিশে খবর দিইনি। আর কেউ জানে না।''

লোকটি বলল, ''গুড! এখন যা বলছি, সেইমতো চলুন। গাড়ি ঘোরান!''

লাইন কেটে গেল।

মোবাইল ফোনে সাধারণত যে ফোন করে, তার নম্বর ফুটে ওঠে। ওরা কিছু একটা কায়দা করেছে, যাতে শুধু দেখা যায় 'প্রাইভেট নম্বর'। তার মানে, অমিতাভ ইচ্ছে করলেও ওদের ফোন করতে পারবেন না।

তিনি সিদ্ধার্থকে বললেন, ''গাড়ি ঘোরাতে বলেছে।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''কোন জায়গায় থামতে হবে, তা এখনও জানাতে চায় না।''

অমিতাভ বললেন, ''আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। কতক্ষণে বিল্টুকে দেখব!''

সিদ্ধার্থ গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। কোথায় যেতে হবে, তা জানা না থাকলে গাড়ি চালাতে খুব অসুবিধে হয়। গাড়ি ঘোরাবার জায়গা পাওয়ামাত্র আবার বেজে উঠল ফোন।

সেই গম্ভীর গলা বলল, ''মিনিটদশেক পর বাঁ দিকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা রাস্তা পাবেন। সেটা ধরবেন।''

সেটা মেমারির রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে খানিকটা যাওয়ার পর আবার ফোন। এবার হুকুম হল, ''গাড়ি আবার ঘোরান। হাইওয়েতে চলে আসুন।''

প্রতিবাদ করার উপায় নেই। ওরা যা বলবে, তা মানতেই হবে!

শক্তিগড়, বর্ধমান বাইপাস পেরিয়ে যাওয়ার পর ফোনে ফের নির্দেশ

এল, ''এবার বাঁ দিকে একটা পেট্রল পাম্প দেখতে পাবেন। সেখানে গাড়িটা ঢুকিয়েই দাঁড়িয়ে থাকবেন। ওখানে কিন্তু পেট্রল পাওয়া যায় না।''

পেট্রল পাম্পে পেট্রল পাওয়া যায় না! এ-কথাটার ঠিক মানে বোঝা গেল না। কাছে এসে বুঝতে পারা গেল যে, পেট্রল পাম্পটা তৈরি হচ্ছে, এখনও খোলাই হয়নি! অন্ধকার, কোনও লোকজন নেই।

গাড়ি থামিয়ে চুপ করে বসে রইল দু'জন।

মিনিটপাঁচেক পর ফোনে আবার শোনা গেল, ''ঠিক আছে, একজন গাড়িতে বসে থাকবেন, আর-একজন টাকার ব্যাগটা নিয়ে নেমে আসবেন। অফিসঘরটা ফাঁকা, তার দরজার সামনে ব্যাগটা রেখে ফিরে যাবেন। অপেক্ষা করবেন দশ মিনিট গাড়িতে বসে। ততক্ষণ টাকাটা মিলিয়ে দেখা হবে। সব ঠিক থাকলে তারপর আপনাদের ছেলেকে ফেরত পাবেন।''

অমিতাভ সুটকেসটা নিয়ে নেমে পড়লেন। সেটা বেশ ভারী। জয়ন্তী আর স্নিগ্ধার সব গয়না বিক্রি করে আর তিন জায়গা থেকে ধার নিয়ে জোগাড় করতে হয়েছে এই টাকা! অমিতাভ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেঁটে এলেন সেই অফিসঘরটার কাছে। তিনি আশা করেছিলেন, সেখানে ওদের দলের সঙ্গে বিল্টুকে দেখতে পাবেন। কেউ নেই। অন্ধকার, কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়। আকাশে একটু একটু জ্যোৎস্না আছে। তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়েও কিছু দেখতে পেলেন না। টাকার ব্যাগটা নামিয়ে রেখে তাঁকে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। তাই অমিতাভ আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পেলেন না।

গাড়িতে ওঠার পর সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল, ''কেউ ছিল ওখানে?''

অমিতাভ বললেন, ''কেউ না। আমরা ঠিক জায়গায় এসেছি তো? অত টাকা। যদি অন্য কেউ নিয়ে যায়!''

সিদ্ধার্থ বলল, ''ওরা যা বলছে, আমরা সেই অনুযায়ী তো এসেছি। এ ছাড়া আর কী করার আছে?''

অমিতাভ বললেন, ''দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে! কতক্ষণে দশ মিনিট হয়?''

সিদ্ধার্থ বলল, ''ছশো সেকেন্ড। আমি গুনছি।''

অমিতাভ ঘড়ির দিকে চেয়ে আছেন।

সিদ্ধার্থ বলল, ''হয়ে গিয়েছে ছশো সেকেন্ড।''

অমিতাভ বললেন, ''তুমি তাড়াতাড়ি গুনে ফেলেছ। আরও দু'মিনিট বাকি।''

ঘড়িতে বারো মিনিট কেটে যাওয়ার পর একটা গাড়ির শব্দ হল। আগে বোঝা যায়নি, একটা বড় গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল একটা কালো রঙের স্টেশন ওয়াগন। সেটা স্টার্ট দিয়েই চলে গেল হাইওয়ের দিকে। তারপরই দেখা গেল, এই গাড়ির দিকে ছুটে আসছে একটা বাচ্চা ছেলে। বিল্টু! সিদ্ধার্থ আর অমিতাভও গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গেলেন বিল্টুর দিকে। মাঝপথে অমিতাভ বিল্টুকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিলেন।

আনন্দের চোটে পাগলের মতো বলতে লাগলেন, ''বিল্টু, বিল্টু! তুই ফিরে এসেছিস! তোর মা যে কান্নাকাটি করছে। উফ! তোর কোথাও লাগেটাগেনি তো!''

বিল্টু মুখ দিয়ে শুধু উঁ উঁ শব্দ করছে আর ছটফটিয়ে নেমে পড়তে চাইছে কোল থেকে।

অমিতাভ বললেন, ''বিল্টু, তুই কথা বলছিস না কেন?''

সিদ্ধার্থ বলল, ''একটা কালো কাপড় দিয়ে ওর মুখটা বাঁধা দেখছি।''

তাড়াতাড়ি বিল্টুকে কোল থেকে নামিয়ে তার মুখের বাঁধনটা খুলে দেওয়া হল।

তখন ছেলেটি বলল, ''মুঝে ছোড় দো!''

অমিতাভ আর সিদ্ধার্থ দু'জনেই যেন আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়লেন! জীবনে কখনও এমন অবাক হননি। এ ছেলেটি তো বিল্টু নয়! একই বয়স। প্রায় একই রকম চেহারা। কিন্তু অন্য ছেলে।

অমিতাভ হতভম্বের মতো হয়ে গিয়ে বললেন, ''ওরা বিল্টুকে ফেরত দিল না। বিল্টু কোথায় গেল?''

এ ছেলেটি বলল, ''বিল্টু কৌন হ্যায়? মেরা নাম পরমজিৎ সিংহ!''

সিদ্ধার্থ বলল, ''ওরা ভুল করেছে। বিল্টুর বদলে অন্য ছেলেকে...স্যার, আপনি শিগগির গাড়িতে উঠে পড়ুন। এখনও যদি ওদের ধরা যায়।''

এর মধ্যে মিনিটপাঁচেক অন্তত কেটে গিয়েছে। বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে অনেক গাড়ি। সিদ্ধার্থ অনেক চেষ্টা করেও সেই কালো গাড়িটাকে আর ধরতে পারল না। ওরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই ফোন করত। ফোনও এল না।

প্রায় পানাগড় ছাড়িয়ে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে সিদ্ধার্থ হতাশভাবে বলল, ''এবার কী হবে?''

অমিতাভ দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে কেঁদে ফেললেন।

পরমজিৎ জিজ্ঞেস করল, ''ইউ আর নট ব্যাড পিপল! ব্যাড পিপল ডোন্ট ক্রাই!''

সিদ্ধার্থ বলল, ''নো পরমজিৎ, উই আর নট ব্যাড পিপল। ডিড ইউ সি অ্যানাদার বয় লাইক ইউ? বিল্টু! ওয়াজ় হি ইন দ্যাট কার?''

পরমজিৎ বলল, ''নো। আই ডিড নট সি হিম। ইউ স্পিক বাংলা? আমি বাংলা জানি। আমার দু'জন বাংগালি ফ্রেন্ড আছে।''

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল, ''ওই গাড়িতে আর কোনও ছোট ছেলে ছিল না?''

পরমজিৎ দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, ''না।''

অমিতাভ চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''তোমাকেও ওরা চুরি করে নিয়ে এসেছে?''

পরমজিৎ বলল, ''ইয়েস। আমি স্কুল থেকে বেরিয়েছি। একটা গাড়ি এল। জোর করে আমাকে তুলে নিল। ওরা খুব খারাপ লোক। আমাকে মেরেছে।''

অমিতাভ শিউরে উঠে বললেন, ''ওরা বিল্টুকেও মেরেছে নাকি?''

পরমজিৎ বলল, ''আমি ওদের একজনের হাত কামড়ে দিয়েছি।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''বেশ করেছ।''

পরমজিৎ বলল, ''তোমরা ভাল লোক। তোমরা আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে?''

সিদ্ধার্থ বলল, ''নিশ্চয়ই পৌঁছে দেব। তোমার বাড়ি কোথায়?''

পরমজিৎ বলল, ''কালিম্পং! ওখানেই আমাদের স্কুল।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''এই রে? অত দূর! আজ রাতে তো আমরা সেখানে যেতে পারব না।''

অমিতাভ বললেন, ''আমাদের বাড়ির লোক চিন্তা করছে। ওরা ভাবছে, আমরা বিল্টুকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। ফিরে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলতে হবে।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''পরমজিৎ, তুমি আমাদের বাড়ি চলো। তোমার ভয় নেই, তোমাকে আর কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারবে না।''

পরমজিৎ বলল, ''তোমাদের বাড়ি কোথায়?''

সিদ্ধার্থ বলল, ''কলকাতায়!''

পরমজিৎ বলল, ''ওঃ। আই লাভ ক্যালকাটা। চিড়িয়াখানায় সাদা বাঘ দেখব।''

সিদ্ধার্থ স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরাল।

কলকাতায় পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল। এর মধ্যে পরমজিৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে অমিতাভ পরমজিৎকে কোলে করে নামলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন জয়ন্তী আর রিনি। ওঁরা তো ধরেই নিলেন যে বিল্টুই ফিরে এসেছে। অমিতাভ উপরে আসার পরে দেখা গেল বিল্টুর বদলে অন্য একটা ছেলেকে!

সব কথা শোনার পর জয়ন্তী ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে মাথা এলিয়ে দিলেন। মনে হল, অজ্ঞান হয়ে যাবেন। টাকাপয়সা, যথাসর্বস্ব গেল, অথচ ছেলেও ফেরত এল না। তার বদলে এল একটা অন্য ছেলে! এ ছেলেকে নিয়েও তো সমস্যা হবে। এখন যদি ওরা ফোন করে বলে যে, ভুল করে ছেলে বদলা-বদলি হয়ে গিয়েছে! পরমজিৎকে কোনও একটা জায়গায় নামিয়ে দিলে তারপর বিল্টু ফেরত আসবে! তখন কী করা হবে?

রিনি বলল, ''জেনেশুনে একটা ছেলেকে কি চোর-ডাকাতদের হাতে তুলে দেওয়া যায়! ওরা যদি কোনও কারণে পরমজিৎকে মেরে ফেলে, তার জন্য আমাদেরও তো দায়ী হতে হবে।''

অমিতাভ বললেন, ''এ ছেলেটাকে ওদের কাছে পৌঁছে না দিলে ওরা কি বিল্টুকে ফেরত দেবে? মোটেই দেবে না।''

রিনি বলল, ''তাও হয়তো ঠিক।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''আমাদের বিল্টুকে আমরা যে-কোনও উপায়ে হোক ফেরত চাইব, তা অবশ্যই ঠিক কথা। কিন্তু অন্যের একটা ছেলেকে জেনেশুনে ওই শয়তানদের হাতে তুলে দেওয়াও ঠিক হতে পারে না।''

রিনি বলল, ''তা হলে এখন কী করা হবে?''

অনেক রাত পর্যন্ত ভেবে ভেবেও এর উত্তর পাওয়া গেল না!

পরদিন সকালে আগে ঘুম ভাঙল পরমজিতের। সে রিনিদের সঙ্গে শুয়েছিল। জেগে উঠে পরমজিৎ রিনির গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, ''হেই, হু আর ইউ?''

রিনি বলল, ''আমার নাম রিনি। আমি বিল্টুর দিদি। আমি তোমারও দিদি হতে পারি।''

পরমজিৎ বলল, ''আমারও দুটো দিদি আছে। দাদা না আছে। মা আছেন, বাবা আছেন। তুমি কালিম্পং দেখেছ?''

রিনি বলল, ''অনেক দিন আগে। ভাল মনে নেই।''

পরমজিৎ বলল, ‘‘চলো আমাদের বাড়ি। অনেক বরফ দেখাব। আমি কখন বাড়ি যাব?’’

রিনি বলল, ‘‘যাবে। সন্ধেবেলা। কেন, আমাদের বাড়ি তোমার ভাল লাগছে না?’’

পরমজিৎ বলল, ‘‘এটা একটা পচা বাড়ি। দেওয়ালে সৌরভ গাঙ্গুলির ছবি কে রেখেছে?’’

রিনি বলল, ‘‘আমার ভাই বিল্টু। কেন, সৌরভ গাঙ্গুলিকে তোমার ভাল লাগে না?’’

পরমজিৎ বলল, ‘‘নো। সচিন তেন্ডুলকর আমার মোস্ট ফেভারিট।’’

রিনি বলল, ‘‘ঠিক আছে, তোমাকে সচিনের ছবিও দেখাব। এখন তুমি কী খাবে? কাল রাতে ঘুমিয়ে ছিলে, কিছু খাওনি।’’

পরমজিৎ বলল, ‘‘কর্নফ্লেক্স খাব। আমি কলা খাই না। জ্যাম-জেলি আর দুধ দিয়ে খাব।’’

রিনি বলল, ‘‘ঠিক আছে, তাই খাবে।’’

দরজার বাইরে থেকে খবরের কাগজটা এনেই চমকে উঠে অমিতাভ বললেন, ‘‘এই রে!’’

রিনি জিজ্ঞেস করল, ‘‘কী হয়েছে বাবা?’’

অমিতাভ কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘‘পরমজিৎকে দেখা। ওর ছবি বেরিয়েছে প্রথম পাতায়।’’

সত্যিই পরমজিতের ছবি। সেই সঙ্গে বড় করে লেখা খবর — ‘কালিম্পং-এর বিখ্যাত ব্যবসায়ী সুরজ সিংহের ছেলে নিখোঁজ। সে অপহরণকারীদেরই হাতে পড়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পুলিশ চারিদিকে খুঁজছে ছেলেটিকে।’

রিনি বলল, ‘‘এবার তো পুলিশকে খবর দিতেই হবে। পুলিশকে জানাতে হবে যে, পরমজিৎ আছে আমাদের বাড়িতে। না জানালে সেটা বেআইনি হবে।’’

অমিতাভ বললেন, ‘‘তখন তো বিল্টুর কথাও বলতে হবে পুলিশকে। না জানিয়ে আর উপায় নেই।’’

রিনি বলল, ‘‘তা হলে তো এখন কাকাবাবুকেও সব জানানো যায়। পুলিশের চেয়েও কাকাবাবুই বেশি সাহায্য করতে পারবেন।’’

সে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল। সন্তু জানাল, কাকাবাবু ভোরবেলাই বেরিয়ে গিয়েছেন, কাউকে কিছু না বলে! সন্তুকেও কিছু জানাননি!

৮

জঙ্গলের মধ্যে একটা বাড়ি। চারপাশ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। হয়তো একসময় ছোটখাটো একটা দুর্গ ছিল। এখন দু'-এক জায়গা ভেঙে পড়েছে, সেখানে গাছ গজিয়ে গিয়েছে। একটা ভাঙা জায়গায় কয়েকটা বড় বড় শিংওয়ালা গোরু বাঁধা থাকে। দুটো বাছুরও রয়েছে। একজন দুধওলা আর তার বউ সেই গোরুর দুধ দোয়। কাছাকাছি গ্রামে দুধ বিক্রি করে আসে। লোকের ধারণা, ওই দুধওলা আর তার বউই ভাঙা বাড়িটা দখল করে আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে বেশি রাতে সেখানে গাড়ি আসে! ভিতরে কয়েকটা ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খাট-বিছানা পাতা। সামনে একটা সরু বারান্দা। সেটা বেশ লম্বা, কিন্তু খাঁচার মতো লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। বোধহয় জঙ্গল থেকে কোনও জন্তু-জানোয়ার এসে হঠাৎ না ঢুকে পড়ে, তাই এই জাল দিয়ে ঘিরে রাখার ব্যবস্থা। মাঝখানের একটা দরজা দিয়ে বাইরে বেরোনো যায়। এখন সেই দরজাটায় তালা ঝুলছে। বাইরের উঠোনের মাঝখানে একটা কুয়ো। তার পাশে বসে আছে একজন মাঝবয়সি মানুষ। লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। সে একটা বেতের ঝুড়ি হাতে নিয়ে মুড়ি খাচ্ছে। সে সারাদিনই মুড়ি খায়। তার পাশে রাখা আছে একটা বন্দুক!

একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল বিল্টু। ছাই রঙের হাফপ্যান্ট আর সাদা হাফশার্ট পরা। এই পোশাকে সে স্কুলে গিয়েছিল, পাঁচদিনের মধ্যে আর খোলা হয়নি! মাথার চুলও আঁচড়ানো নেই।

তালা লাগানো দরজাটার কাছে এসে বিল্টু বাইরের লোকটাকে বলল, "অ্যাই, দরজাটা খুলে দাও। আমি উঠোনে যাব।"

লোকটি একবার মুখ তুলে শুধু বিল্টুকে দেখল। উত্তর না দিয়ে মুড়ি খেতে লাগল আবার।

বিল্টু বলল, "এই লটপট সিংহ, তালাটা খুলে দাও না!"

লোকটির ভুরু কুঁচকে গেল। বোঝাই গেল যে, তার নাম লটপট সিংহ নয়! তবু সে কোনও কথা বলল না।

বিল্টু বলল, "তা হলে কিন্তু আমি দুধ খাব না।"

কোনও উত্তর নেই।

বিল্টু বলল, ''রুটিও খাব না। ওই গোল গোল রুটি খেতে আমার বিচ্ছিরি লাগে। আমি পাউরুটি খাই। আমাকে পাউরুটি দেবে!''

লোকটি আর মুখও তুলছে না।

বিল্টু বলল, ''আমি মুড়িও খাই না। এই বোবা সিংহ, তালা খুলে দেবে কিনা বলো! না হলে কিন্তু আমি এখানেই হিসি করে দেব।''

লোকটি এবার তাড়াতাড়ি উঠে এসে কোমর থেকে চাবির গোছা বের করে তালাটা খুলতে লাগল।

বিল্টু তার দিকে জিভ ভেঙিয়ে বলে উঠল,

''হুঁকোমুখো হ্যাংলা, বাড়ি তার বাংলা
মুখে তার হাসি নাই দেখেছ?
নাই তার মানে কী? কেউ তাহা জানে কি?
কেউ কভু তার কাছে থেকেছ?''

দরজাটা খোলা হতেই বিল্টু এক দৌড়ে উঠোনের এক কোণে চলে গেল। তারপর হিসি করতে লাগল একটা ঝোপের মধ্যে। সেখান থেকেই মুখ ফিরিয়ে বলল, ''এই যে হুঁকোমুখো সিংহ, আমার কাগজ আর রং-পেনসিল চাই।''

লোকটি এবার চিৎকার করে বলল, ''মেরা নাম শিবু সর্দার। কোই সিংহ মিংহ নেহি হ্যায়।''

বিল্টু বলল, ''শিবু সর্দার? তোমার নাম না বললে আমি জানব কী করে? আমার নাম নীলধ্বজ। বলতে পারবে? না উচ্চারণ করতে গেলে দাঁত ভেঙে যাবে? 'বিল্টু' বলেও ডাকতে পারো।''

শিবু সর্দার বলল, ''যাও, ভিতর যাও।''

বিল্টু বলল, ''ইস! বললেই আমি যাচ্ছি আর কী! এখন আমি গাছে চড়ব!''

শিবু সর্দার ধমক দিয়ে বলল, ''নেহি! যাও, ভিতর যাও!''

বিল্টু ডান হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে নেড়ে বলল, ''যাব না! যাব না!''

এবার শিবু সর্দার দৌড়ে ওকে ধরতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিল্টু চলে এল কুয়োটার অন্য দিকে।

তারপর শিবু সর্দার যতই ওকে ধরার চেষ্টা করে, ততই জোরে বিল্টু ঘোরে কুয়োর চারপাশে। শিবু সর্দার ওকে ধরতে পারে না, বিল্টু খিলখিল করে হাসে।

খানিক পরে হাঁফিয়ে গেল শিবু সর্দার। সে বিল্টুর দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, ‘‘একবার পকড়নে সে বহুত মারব তুমাকে!’’

বিল্টু আবার জিভ ভেঙিয়ে বলল,

‘‘রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা
হাসির কথা শুনলে বলে,
‘‘হাসব না-না-না-না!’’
সদাই মরে ত্রাসে, এই বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশেপাশে।
ঘুম নাহি তার চোখে আপনি বসে-বকে
আপনারে কয়, ‘‘হাসিস যদি
মারব কিন্তু তোকে!’’

শিবু সর্দার দু’হাতে কান চাপা দিয়ে বলল, ‘‘উফ, পাগল কর দেগা এ লেড়কা!’’

বিল্টু হেসে হেসে মাথা দোলাতে লাগল।

শিবু সর্দার দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ‘‘তুমার বাবা-মা তুমসে ওয়াপস নেহি লেগা। তুম ঘর নেহি জায়েগা।’’

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, ‘‘ওয়াপস মানে কী?’’

শিবু সর্দার বলল, ‘‘তুমাকে বাবা-মা ফিরত চায় না। তুমাকে এখানেই থাকতে হবে।’’

বিল্টু হাততালি দিয়ে বলতে লাগল, ‘‘এখানেই থাকতে হবে? কী মজা! কী মজা! রোজ রোজ স্নান করতে হবে না। স্কুল যাওয়ার জন্য মোজা পরতে হবে না। মাল্টি ভিটামিন খেতে হবে না, কী মজা! এই জঙ্গলে বাঘ আছে?’’

শিবু বলল, ‘‘হ্যায়। বাঘ তুমাকে খাবে।’’

বিল্টু বলল, ‘‘আমার আগে তোমাকে খাবে। তোমার গায়ে বেশি মাংস।’’

শিবু বন্দুকটা দেখিয়ে বলল, ‘‘হাম গোলি মার দেগা। শের খতম হো যায়েগা।’’

বিল্টু বলল, ‘‘না, বাঘ মারবে না! বাঘ আমার বন্ধু। আমি বাঘের ছবি আঁকি। তুমি বন্দুক রাখো কেন? তোমরা বুঝি ডাকাত?’’

শিবু সর্দার বলল, ‘‘বকবক মাত করো। যাও, অভি ঘরে যাও!’’

বিল্টু বলল, ‘‘ও, কথা বলতে গিয়ে অনেকক্ষণ বুঝি মুড়ি খাওয়া হয়নি? খাও, একটু খেয়ে নাও। আমি মোটেই এখন ঘরে যাচ্ছি না। তুমি চোর-পুলিশ খেলতে জানো?’’

শিবু সর্দার দারুণ চমকে উঠে বলল, ‘‘পুলিশ? পুলিশকা নাম মাত করো।’’

বিল্টু তবু বলল, ‘‘আমি পুলিশ আর তুমি চোর। ডাকাত আর চোর তো একই!’’

শিবু সর্দার রেগে গিয়ে বলল, ‘‘ঝুট বাত। চোর লোক ছোটালোক। ডাকাত সব বড়া আদমি।’’

বিল্টু আবার হি হি করে হেসে উঠল।

রাগ করে মুড়ি খেতে শুরু করল শিবু সর্দার। এ ছেলেটা কিছুতেই ভয় পায় না, ভয় দেখালেও হাসে।

পাশের জঙ্গলে কীসের যেন একটা হুড়মুড় করে শব্দ হল। এ উঠোন থেকে কিছু দেখা যায় না। ডেকে উঠল একটা গোরু।

বিল্টু বলল, ‘‘বাঘ এসেছে? আমি দেখব, আমি দেখব!’’

সে পাঁচিলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেই শিবু সর্দার খপ করে চেপে ধরল তার একটা হাত। সে বলল, ‘‘শের নেহি, শোর হো সকতা। দিনকা টাইম মে শের!’’

বিল্টু বলল, ‘‘শোর মানে কী?’’

শিবু বলল, ‘‘শোর মানে শোর। ঘোঁত-ঘোঁত আওয়াজ করে।’’

বিল্টু বলল, ‘‘ও বুঝেছি। শূকর। কিংবা যদি বানর হয়?’’

শিবু বলল, ‘‘হাঁ হাঁ, বান্দর। তুমহার মতন।’’

বিল্টু বলল, ‘‘আমি বান্দর? মোষকে হিন্দিতে কী বলে? তুমি একটা হিন্দি মোষ। হাত ছাড়ো!’’

শিবু ওর হাত ছাড়ল না। টানতে টানতে নিয়ে গেল বারান্দাটায়। দরজা বন্ধ করে লাগিয়ে দিল তালা।

বিল্টু বলল,

‘‘লটপট সিং ঝটপট সিং
শিং শিং দুটো শিং

মুড়ি খায় ভুঁড়ি দাস
গান গায়, ইয়ে, কী যেন, হাঁসফাস
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক
ভুঁড়ি দাস প্যাঁক প্যাঁক
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক''

শিবু সর্দার রেগেমেগে তালা খুলে বিল্টুকে মারতে আসতেই বিল্টু দৌড়ে ঢুকে গেল একটা ঘরে। সেখানে খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে আর-একটি লোক। শিবু সেই ঘরে ঢুকল না।

৯

দুপুরে বেশ গরম ছিল, বিকেলে কিছুক্ষণ বৃষ্টি হল। বিল্টু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘরের জানলা খোলা, বৃষ্টির ছাঁট এসে গায়ে লাগতেই বিল্টুর ঘুম ভেঙে গেল। উঠে এসে সে জানলা বন্ধ করল না। দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে লাগল বাইরের বৃষ্টি। তার জামা ভিজে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে তো বারণ করার কেউ নেই। মা কিংবা দিদি দেখতে পেলে তাকে বকুনি দিত। তাদের বাড়ি এখান থেকে কত দূরে? ওরা বিল্টুকে ধরে আনার পর বিল্টু একবারও কাঁদেনি। শুধু রাত্তিরবেলা তার খুব মন কেমন করে। রাতে সে মায়ের পাশে শুয়ে ঘুমোয়। মা তার চুলে বিলি কেটে দেন। এখানে এসে তার ছবি আঁকতেও ইচ্ছে করে। কিন্তু কাগজ নেই, রং-পেনসিল নেই, আঁকবে কী দিয়ে? একটা গোরুর বাছুর যখন দুধ খায়, সেই ছবিটা আঁকলে বেশ হত। বিল্টু তার একটা আঙুল দিয়ে হাওয়ার মধ্যে ছবিটা আঁকার চেষ্টা করে। হাওয়ার ছবি আর তো কেউ দেখতে পাবে না, বিল্টু নিজে শুধু দ্যাখে। এখানে একটা বইও নেই। 'আবোল তাবোল'-এর সব কবিতা তার মুখস্ত। সেইগুলোই সে মনে মনে বলে বারবার।

ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল বারান্দায়। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। তবু কুয়োর ধারে ছাতা মাথায় দিয়ে বসে আছে শিবু সর্দার। বসে বসেই ঘুমে ঢুলছে।

বিল্টু চেঁচিয়ে বলল, ''ও শিবুদাদা, তালাটা খুলে দাও!''

শিবু শুনলই না!

বিল্টু আবার ডাকল, "ও শিবুদাদা, শিবুদাদা। আমি আর তোমায় লটপট সিংহ বলব না। প্যাঁক প্যাঁক বলব না।"

শিবুর ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে, তবু সে সাড়া দিচ্ছে না। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। এর নাম তিলকরাম। শিবু আর তিলকরাম, এই দু'জনই এখানে থাকে সব সময়। এরা দু'জন পাহারা দেয় বিল্টুকে। শিবু দিনের বেলা, আর তিলকরাম রাতে। তিলকরামের ক্ষমতা বেশি, তাকে শিবু ভয় পায়। তিলকরাম মাঝে মাঝে শিবুর মাথায় চাঁটি মারলেও সে কিছু বলে না! মাঝে মাঝে রাতের দিকে আসে অন্য লোকেরা।

তিলকরাম হেঁকে বলল, "এ শিব্বু, শিব্বু! তালা খোল দে।"

শিবু অমনি ধড়মড় করে ছুটে এসে তালা খুলে দিল।

তিলকরাম তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, "চায় কা টাইম হো গয়া। আর এ খোঁকাকে দুধ পিলাতে হবে না? দুধের বর্তন কঁহা?"

শিবু দৌড়ে গিয়ে এক কোণের রান্নাঘর থেকে একটা বড় ঘটি নিয়ে এল।

তিলকরাম বলল, "চলো খোঁকা, মেরা সাথ চলো।"

বিল্টু বলল, "আমি যদি এক দৌড়ে পালিয়ে যাই?"

তিলকরাম মাথা নেড়ে বলল, "না, তুমি পালাবে না। তুমি যদি পালাও, তবে হামাদের নোকরি চলে যাবে। মেরেও ফেলতে পারে।"

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, "কে মারবে?"

তিলকরাম বলল, "বড়াবাবু। রাত মে যো আতা হ্যায়।"

বিল্টু বলল, "তুমি তাকে মারতে পারো না?"

তিলকরাম বলল, "আরেব্বাস! বড়াবাবুর বহুত পাওয়ার!"

উঠোন পেরিয়ে ওরা হাঁটতে হাঁটতে গেল দেওয়ালের ভাঙা অংশটার দিকে।

একজন দুধওলা সেখানে একটা ধবধবে সাদা রঙের গোরুর দুধ দুইছে।

তিলকরাম ঘটিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "ভরতি কর দেও!"

বিল্টু আগে কখনও এমন সামনে থেকে গোরুর দুধ দোয়া দেখেনি। চ্যাঁ চোঁ শব্দ হচ্ছে, গোরুটা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে দেখছে বিল্টু। একটুক্ষণের মধ্যেই ঘটিটা ভরে গেল।

তিলকরাম ঘটিটা হাতে নিয়ে বলল, "আজ বড়াবাবু আ সকতা। চলো খোঁকা।"

বিল্টু বলল, ''তোমাকে কতবার বলেছি, আমার নাম খোঁকা নয়। নীলধ্বজ। বিল্টুও বলতে পারো।''

তিলকরাম বলল, ''বল্টু? ঠিক হ্যায়?''

বিল্টু বলল, ''বল্টু নয় বিল্টু। তুমি যদি আমায় বল্টু বলো, তা হলে আমিও তোমার নাম বলব, তেলাপোকা, আরশোলা!''

তিলকরাম বলল, ''হামি তব তুমাকে বলব, পেরেক!''

বিল্টু বলল, ''আমি তোমাকে বলব বকচ্ছপ! কিংবা হাঁসজারু!'' বলেই হেসে ফেলল বিল্টু।

তিলকরামও হাসল। তারপর বলল, ''তুমাকে ইঁহা পর কিতনা দিন রাখনে হোগা তা কৌন জানে! তুমহার কোষ্টো হচ্ছে না?''

বিল্টু বলল, ''না তো!''

তিলকরাম বলল, ''বহুত লেড়কা দেখা, লেকিন তোমার মতন অউর নেহি দেখা।''

বিল্টু বলল, ''তিলকদাদা, আমাকে জঙ্গলে বেড়াতে নিয়ে যাবে?''

তিলকরাম বলল, ''আজ রাতে বড়াবাবু আনেসে কাল সকালে লৌট যাবে। অউর দো-তিনদিন নেহি আয়েগা। তব তুমাকে জঙ্গলমে নিয়ে যাব। ঠিক হ্যায়?''

উঠোনে এসে সে শিবু সর্দারকে দুধের ঘটিটা দিয়ে বলল, ''খোঁকাকো দুধ পিলা দেও। ম্যায় গ্রামসে ঘুমকে আতা হ্যায়।''

শিবু বলল, ''থোড়া ঠাহর যাও। এ লড়কা ইধার উধার কঁহা ভাগে গা।'' দুধ গরম করতে সে ঢুকে গেল রান্নাঘরে।

বিল্টু তিলকরামকে বলল, ''তুমি আবার আমাকে খোঁকা বললে? তা হলে আমি দুধ খাব না।''

তিলকরাম বলল, ''আচ্ছা, আচ্ছা, তুমহার নাম বল্টু।''

বিল্টু ধমক দিয়ে বলল, ''আবার বল্টু বলছ? তুমি একটা আরশোলা। তুমি গ্রামে যাবে, গ্রাম কত দূরে?''

তিলকরাম বলল, ''ছে-সাত মাইল হোবে।''

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, ''তুমি হেঁটে হেঁটে যাবে?''

তিলকরাম বলল, ''নেহি। সাইকেল হ্যায়। তুরন্ত ঘুমকে আনা হ্যায়।''

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, ''তুরন্ত মানে কী?''

তিলকরাম বলল, ''তুরন্ত মানে, ইয়ে হ্যায়, মানে তাড়াতাড়ি।''

বিল্টু বলল, ''আমাকে নিয়ে চলো, প্লিজ় নিয়ে চলো। আমি সাইকেলের পিছনে চাপব। প্লিজ়।''

তিলকরাম বলল, ''পাগল! পিলিজ ফিলিজ মাত বোলো।''

শিবু একবাটি দুধ নিয়ে আসতেই সে বলল, ''লেড়কা কো ঠিক সে দেখভাল কর না।''

সে চলে গেল উঠোন পেরিয়ে।

শিবু বলল, ''দুধ পি লেও।''

বিল্টু দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, ''না। দুধ খাব না।''

শিবু জিজ্ঞেস করল, ''কিঁউ খাবে না? বড়াবাবু আকেই পুছে গা, বাচ্চা কেয়া-কেয়া খায়া অউর পিয়া।''

বিল্টু বলল, ''ও কেন আমাকে সাইকেলে নিয়ে গেল না? আমি তোমাদের এখানে আর কিছু খাব না।''

শিবু বলল, ''ইয়ে কেয়া তুমহারা মামাবাড়ি হ্যায়? খাও!''

সে দুধের বাটিটা বিল্টুর মুখের কাছে আনতেই বিল্টু হাত দিয়ে সেটা সরিয়ে দিতে গেল। তখনই পিছন থেকে কে যেন বলল, ''দুধটা খেয়ে নে বিল্টু। আমাদের এখনই যেতে হবে।''

বিল্টু চমকে পিছন ফিরে তাকাল। কাকাবাবু!

শিবু সর্দারও দারুণ অবাক হয়ে বলল, ''ইয়ে কৌন হ্যায়?''

সে কুয়োর গায়ে হেলান দিয়ে রাখা বন্দুকটা ধরতে যেতেই কাকাবাবু বাঁ হাতের ক্রাচটা দিয়ে সেটাকে ঠেলে দিলেন দূরে। তাঁর ডান হাতের রিভলভারটা শিবুর কপালের দিকে তাক করা। কাকাবাবু কয়েক পা এগিয়ে এসে শিবুর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, ''তুই ঠিক আছিস তো রে বিল্টু?''

বিল্টু বলল, ''হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ। এবার কী হবে? ডিসুম ডিসুম?''

কাকাবাবু বললেন, ''দ্যাখ না কী হয়!'' তিনি শিবুকে বললেন, ''ওহে, তুমি কিন্তু একদম নড়াচড়া করবে না। তা হলে তোমার বেশি বিপদ হবে। এখন হাঁ করো তো, বেশ বড় করে।''

কাকাবাবু কোটের এক পকেট থেকে একটা কালো রঙের উলের বল বের করলেন। তার দু'পাশে ফিতে বাধা। সেই উলের বলটা তিনি শিবু সর্দারের মুখে ঢোকাতে যেতেই সে কাকাবাবুর ডান হাতে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি কষাল। কাকাবাবুর ডান হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রিভলভারটা!

সে সেটা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করার আগেই কাকাবাবু তাঁর একটা ক্রাচ তার গলায় চেপে ধরে বললেন, ''ইসকা ভিতর মে একঠো ছুরি হ্যায়। খুব ধার। তুমি একটু নড়াচড়া করলেই তোমার গলাটা কুচ করে কেটে যাবে।''

বিল্টু দৌড়ে গিয়ে রিভলভারটা ধরতে যেতেই কাকাবাবু বলে উঠলেন, ''অ্যাই ধরিস না, ধরিস না। বন্দুক-পিস্তল ধরার তোর এখনও বয়স হয়নি। তুই বরং এক কাজ কর। এই উলের বলটা ওর মুখে ভরে দে তো!'' ক্রাচটা সরিয়ে এনে কাকাবাবু বললেন, ''তুমি আমার হাতে লাথি মেরেছ। এবার আমি উলটে তোমাকে মারতে পারি? আমি নিজে থেকে কাউকেই আগে মারি না। এই ক্রাচের এক ঘায়ে তোমার মাথা ফাটিয়ে দিতে পারি। তুমি তাই চাও, না হাঁ করবে!''

এবার শিবু সর্দার হাঁ করতেই বিল্টু তার মুখে বলটা ভরে দিল। তারপর হাসতে লাগল হি হি করে।

কাকাবাবু বললেন, ''এবার ফিতে দুটো ওর মাথার পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেল খুব টাইট করে।''

বাঁধতে বাঁধতে বিল্টু বকুনি দিয়ে বলল, ''অ্যাই, মাথা নাড়াচ্ছ কেন? গাঁট্টা খাবে!''

কাকাবাবু সঙ্গের একটা ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা লম্বা দড়ি বের করে বললেন, ''এবার ভালয়-ভালয় হাতদুটো সামনে এগিয়ে দাও তো! এখনও কিন্তু আমি তোমাকে মারিনি।''

শিবু সর্দার হাতদুটো এগিয়ে দিল। কাকাবাবু শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। আর-একটা দড়ি দিয়ে বাঁধলেন পা দুটো। তারপর রুমাল দিয়ে হাত মুছে বললেন, ''ব্যস, ওকে নিয়ে আর চিন্তা নেই।'' রিভলভারটা পকেটে ভরে নিয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''হ্যাঁরে বিল্টু, একটা লোক তো সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল। এখন ভিতরে আর কেউ আছে?''

বিল্টু বলল, ''না তো। আর কেউ থাকে না।''

কাকাবাবু বললেন, ''তবে তো ভালই হল! তা হলে চল, আমরা বাড়ি যাই।''

বিল্টু বলল, ''বাড়ি যাব? আমরা এই জঙ্গলে বেড়াতে যাব না?''

কাকাবাবু হেসে ফেললেন। বিল্টুর কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, ''এখন কি বেড়াতে যাওয়ার সময় রে! তোর মা-বাবা কত চিন্তা করছেন।''

শিবু সর্দার মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ করছে।

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তুমি এইভাবেই থাকো। তোমার লোকজন এসে বাঁধন খুলে দেবে। চল রে বিল্টু!’’

ক্রাচ বগলে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন কাকাবাবু। তাঁর আগে আগে বিল্টু চলল লাফাতে লাফাতে।

সে জিজ্ঞেস করল, ‘‘কাকাবাবু, তুমি এই জায়গাটা কী করে চিনলে?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলে এলাম। তোকে এখানে খেতেটেতে দিয়েছে তো ঠিকমতো?’’

বিল্টু বলল, ‘‘শুধু দুধ আর দুধ! আমার ভাল্লাগে না।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘শুধু দুধ? আর কিছু দেয়নি?’’

বিল্টু বলল, ‘‘রুটি, আর কিছু না।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘আমি দুপুর থেকে এখানে লুকিয়ে আছি। ভিতরে ক’জন লোক আছে, তা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। তারপর ভাবলাম, রাত হওয়ার আগেই একটা কিছু করতে হবে। বেশ সহজেই কাজটা মিটে গেল, কী বল!’’

বিল্টু এক জায়গায় থেমে গিয়ে বলল, ‘‘কাকাবাবু, দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর একটা প্রজাপতি!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘হ্যাঁ, খুব সুন্দর। কিন্তু আমাদের তো আর দেরি করলে চলবে না। বেশি অন্ধকার হওয়ার আগেই বড় রাস্তায় পড়তে হবে।’’

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, ‘‘বড় রাস্তায় কী আছে?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ওখান দিয়ে অনেক গাড়ি যায়। আমরা একটা গাড়িতে উঠে পড়ব।’’

দেওয়ালের ভাঙা জায়গাটা দিয়ে ওরা বাইরে বেরিয়ে এল।

কিছুটা যেতেই দেখা গেল, জঙ্গলের দিক থেকে আসছে একজন দুধওলা। তার মাথায় শুকনো গাছের ডালের বোঝা।

সে ওদের দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, ‘‘অ্যাই, তুম লোগ কাঁহা যাতা হ্যায়? এই লেড়কা, রোকো, রোকো!’’

বিল্টু বলল, ‘‘এই রে!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘একজন মোটে? ঠিক আছে, ম্যানেজ হয়ে যাবে।’’

দুধওলাটি মাথার কাঠের বোঝাটা মাটিতে ফেলে দিল। তারপর একটা ডাল তুলে ছুড়ে মারল কাকাবাবুর দিকে।

কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রাচ তুলে সেটাকে আটকালেন। লোকটি আরও একটি ডাল ছুড়লে সেটিও আটকালেন কাকাবাবু।

বিল্টু হাততালি দিয়ে বলল, ‘‘কী মজা! কী মজা! ওই যে কাকাবাবু, আবার!’’

ঠিক যেন ক্রিকেট খেলা। কাকাবাবুর হাতে ব্যাটের বদলে ক্রাচ। আর লোকটি বলের বদলে গাছের ডাল ছুড়ছে। কয়েকবার আটকানোর পর কাকাবাবুর মনে হল, তাঁর ক্রাচ ভেঙে যেতে পারে। এই খেলা বেশিক্ষণ চালানো যাবে না।

লোকটিকে ভয় দেখানোর জন্য তিনি কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘাড়ে ঠেকল একটা ঠান্ডা নল। একজন গম্ভীর গলায় বলল, ‘‘রায়চৌধুরী, তোমার খেলা শেষ। একটুও নড়বে না। নড়লেই অটোমেটিক রাইফেলের গুলিতে তোমার মাথার ঘিলু বেরিয়ে যাবে।’’

কাকাবাবু মাথা না নাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘বিল্টু, আমার পিছন দিকে ক’জন লোক রে?’’

বিল্টু বলল, ‘‘দু’জন।’’

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘দু’জনের হাতেই বন্দুক আছে?’’

বিল্টু বলল, ‘‘হ্যাঁ আছে। লম্বা লম্বা।’’

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘‘তা হলে তো ধরা দিতেই হয়। বলো, এবার কী করতে হবে।’’

কালো চশমা আর টুপি পরা একজন লোক কাকাবাবুর পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে নিল। তারপর তার রাইফেলের বাঁট দিয়ে খুব জোরে মারল কাকাবাবুর পেটে। কাকাবাবু অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারেন। কিন্তু পেটের ওই আঘাতে তিনি ‘উঃ’ করে উঠলেন।

বিল্টু চেঁচিয়ে উঠল, ‘‘অ্যাই, অ্যাই, দুষ্টু লোক, তোমরা কাকাবাবুকে মারছ কেন?’’

কালো চশমা পরা লোকটা অন্য লোকটাকে বলল, ‘‘বাচ্চাটার মুখ চেপে ধর, শক্ত করে ধরে রাখ।’’ সে আবার মারতে লাগল কাকাবাবুর পেটে।

কয়েকবার আঘাতের পর কাকাবাবু আর সহ্য করতে পারলেন না। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

কালো চশমা পরা লোকটা মুখ বেঁকিয়ে বলল, ‘‘আজ এই রায়চৌধুরীর সব লীলাখেলা শেষ। ওর মুন্ডুটা কেটে জলে ফেলে দেব আর বডিটা খাবে জঙ্গলের শিয়ালে।’’

কাকাবাবুর একটা পা ধরে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে সে নিয়ে চলল উঠোনটার দিকে।

১০

সকাল ন'টাতেই পুলিশ এসে হাজির। ডেপুটি কমিশনার অশেষ দত্ত সিদ্ধার্থকে দেখে বললেন, ''আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো? চেনা চেনা লাগছে!''

সিদ্ধার্থ বলল, ''কাকাবাবুর বাড়িতে দেখেছেন। সেখানে একদিন আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।''

অশেষ দত্ত বললেন, ''দ্যাট্স রাইট। কাকাবাবু আপনার খুব প্রংশসা করেছিলেন। একবার কাশ্মীরে আপনি খুব সাহায্য করেছিলেন ওঁকে। কাকাবাবু কোথায়? তিনি খবর পাননি?''

সিদ্ধার্থ বলল, ''আগে আমরা ওঁকে কিছু বলিনি। আজই একটু আগে ফোন করতে গিয়ে জানা গেল, উনি কলকাতায় নেই। কোথায় গিয়েছেন, কেউ জানে না।''

অশেষ দত্ত বললেন, ''আপনারা পুলিশেও তো আগে খবর দেননি।''

অমিতাভ বললেন, ''ওরা বারণ করেছে। ওরা ভয় দেখিয়েছে যে, পুলিশকে জানালে বিল্টুর ক্ষতি হবে। আচ্ছা মিস্টার দত্ত, এখন কী হবে বলুন তো?''

অশেষ দত্ত বললেন, ''অনেক কিডন্যাপিং কেসের কথা জানি। কিন্তু আপনাদের মতো এমন পিকিউলিয়ার কেসের কথা কখনও শুনিনি!''

অমিতাভ বললেন, ''ছেলেটাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে টাকা চাইল। অত টাকা! আমাদের পক্ষে জোগাড় করা কি সহজ কথা? যাই হোক, যথাসর্বস্ব খুইয়ে তো টাকাটা জোগাড় করা হল। ওদের কথামতো দিয়েও দেওয়া হল। কিন্তু আমার ছেলেকে ফেরত পাওয়া গেল না।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''তার বদলে পেলাম অন্য একটা ছেলেকে!''

অশেষ দত্ত বললেন, ''এ ছেলেটির বাবা খুব বড়লোক। ছেলেকে ফেরত পাওয়ার পর সব কথা শুনে হয়তো আপনাদের টাকাটা দিয়ে দেবেন।''

অমিতাভ জোর দিয়ে বলে উঠলেন, ''সে টাকা পেয়েই বা আমাদের লাভ কী? আমরা বিল্টুকে ফেরত পাব কী করে?''

অশেষ দত্ত বললেন, ''আমাদের দিক থেকে আমরা তাকে উদ্ধার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। যদি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকে, তা হলে খুঁজে বের করতে একটু মুশকিল হবে। আমরা সব স্টেটকেই জানিয়ে দিচ্ছি। ওরা আর ফোনটোন করেনি?''

সিদ্ধার্থ বলল, ''নাঃ, কোনও সাড়াশব্দ নেই!''

অশেষ দত্ত বললেন, ''চলুন, একবার পরমজিৎকে দেখি।''

পরমজিৎ রিনির ঘরে বসে ছবি আঁকা শিখছে। তার ছবি আঁকার একেবারেই হাত নেই।

রিনি মাত্র কয়েকটা টানে এক-একজন মানুষের মুখ এঁকে ফেলছে দেখে সে খুব অবাক! রিনি পরমজিতেরও একটা সুন্দর ছবি এঁকে দিয়েছে।

অশেষ দত্ত একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই সব ছবি দেখে বললেন, ''বাঃ! তোমার ভাই ছবি এঁকে অল ইন্ডিয়া ফার্স্ট প্রাইজ় পেয়েছে শুনলাম। তোমরা ভাই-বোন দু'জনেই ছবি আঁকো?''

রিনি বলল, ''আমার মা-ও ছবি আঁকতে পারেন।''

অশেষ দত্ত বললেন, ''আর্টিস্ট ফ্যামিলি!''

রিনি জিজ্ঞেস করল, ''আপনি আমার ভাইকে এনে দিতে পারবেন তো? এই শনিবার তাকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার কথা।''

অশেষ দত্ত বললেন, ''আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট। নাউ মাস্টার সিংহ, লেট আস গো।''

পরমজিৎ জিজ্ঞেস করল, ''হোয়্যার?''

অশেষ দত্ত বললেন, ''পুলিশ স্টেশন। বড় থানায়।''

পরমজিৎ বলল, ''কেন, আমি থানায় যাব কেন?''

অশেষ দত্ত বললেন, ''তোমার বাবা আসবেন, থানা থেকে তোমায় নিয়ে যাবেন। উনি বিকেলের মধ্যেই এসে পড়বেন প্লেনে।''

পরমজিৎ বলল, ''আমি থানায় যাব না। আমি এখানে থাকব।''

রিনি বলল, ''আমার ভাইকে ফেরত না পেলে আমরাও ওকে ছাড়ব না!''

অশেষ দত্ত বললেন, ''এ তো বড় মুশকিল হল!''

রিনি বলল, ''কেন, আমি অন্যায় কিছু বলেছি?''

অশেষ দত্ত বললেন, ''না, তুমি অন্যায় কিছু বলোনি। কিন্তু পুলিশের নিয়ম হচ্ছে, হারিয়ে যাওয়া কারও খবর পেলেই তাকে নিজেদের কাছে নিয়ে রাখতে হয়।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''থানায় চোর-ডাকাতদের মধ্যে বসিয়ে রাখার চেয়ে আমাদের এখানে ওর থাকাটাই কি ভাল নয়? ও নিজেও তো তাই চাইছে।''

অশেষ দত্ত চিন্তিতভাবে বললেন, ''না, চোর-ডাকাতদের সঙ্গে নয়। আমার ঘরেই ওকে বসিয়ে রাখতে পারি। অবশ্য, আমার ঘরে অতক্ষণ একটা ছোট ছেলের ভাল লাগবে কেন? আপনাদের এখানে থাকলে...যদি কেউ এখান থেকে ওকে আবার চুরি করে নিয়ে যায়? তখন ওর বাবার কাছে কী কৈফিয়ত দেব?''

সিদ্ধার্থ বলল, ''বাড়ির মধ্যে ঢুকে কে চুরি করে নিয়ে যাবে?''

অশেষ দত্ত বললেন, ''বলা যায় না। ঠিক আছে, ছেলেটা এখানেই থাক। বাড়ির সামনে দু'জন পুলিশকে পাহারায় রেখে যাচ্ছি। ছেলেটাকে নিয়ে একদম বাইরে যাবেন না। ওর বাবা এসে পৌঁছোন, তারপর অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''এর মধ্যে যদি ওরা ফোন করে? যদি বলে, পরমজিৎকে কোনও একটা জায়গায় রেখে এলে ওরা বিল্টুকে ফেরত দেবে? তখন আমরা কী করব?''

অশেষ দত্ত বললেন, ''তখনই আমাদের জানাবেন।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''যদি ওরা বিল্টুকে মেরে ফেলার ভয় দেখায়?''

রিনি বলল, ''আমরা বিল্টুকে চাই। কিন্তু পরমজিৎকেও কোনও বিপদের মুখে ফেলতে চাই না। তা হলে কী করা যায় বলুন?''

অশেষ দত্ত বললেন, ''এখনই কিছু বলতে পারছি না। ওরা ফোন করে কী বলে, আগে সেটা দেখা যাক। যদি বিল্টুর বদলে পরমজিৎকে ফেরত চায়, তা হলে খানিকটা সময় চেয়ে নেবেন। বলবেন, দিনের বেলা তো পুলিশের সামনে দিয়ে পরমজিৎকে বের করা যাবে না। বরং ভোর রাতে...''

একটু থেমে গিয়ে অশেষ দত্ত বললেন, ''ইস, এই সময় যদি কাকাবাবুর সাহায্য পাওয়া যেত! তিনি নিশ্চয়ই একটা উপায় বের করতেন!''

১১

দিনের বেলা এখানে একটু একটু গরম পড়লেও রাতে বেশ ঠান্ডা পড়ে। উঠোনের একপাশে কিছু চ্যালা কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালা হয়েছে। সেই আগুন ঘিরে বসে আছে ওরা কয়েকজন। বিল্টুর একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে শিবু সর্দার। কাকাবাবু উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে। এখনও তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। কালো চশমা পরা লোকটা অন্ধকারেও চশমা খোলেনি। বোধহয় তার চোখের অসুখ আছে। সে-ই বড়বাবু। আর তার পাশের লোকটির নাম বলরাম। তার চেহারাটা ভীমের মতো। মুখ ভরতি দাড়ি-গোঁফ, কিন্তু মাথাটা ন্যাড়া।

চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বড়বাবু জিজ্ঞেস করল, ''আরে শিবু, সত্যি করে বল, তিলকরাম কোথায় গিয়েছে?

শিবু সর্দার বলল, ''গাঁও মে গিয়া বড়াসাব।''

বড়বাবু ভেঙিয়ে বলল, ''গাঁও মে গিয়া? কাঁহে গিয়া। নাকি একেবারেই কেটে পড়েছে?''

শিবু বলল, ''সে তো হামি জানি না বড়াসাব।''

বড়বাবু বলল, ''আমার হুকুম, তোমরা দু'জনে কেউ এক মিনিটের জন্যও বাইরে যেতে পারবে না। সর্বক্ষণ পাহারা দেবে। এই খোঁড়া লোকটা যদি আজ ছেলেটাকে নিয়ে পালাত? এই ডেরার খবর জেনে যেত! বলরাম আর আমি একেবারে ঠিক সময়ে এসে পড়েছি ভাগ্যিস!''

বলরাম বলল, ''রায়চৌধুরীকে এবার বাগে পাওয়া গিয়েছে। ওকে খতম করে দিতে হবে।''

বড়বাবু বলল, ''অনেকক্ষণ নড়াচড়া করছে না, টেঁসেই গেল নাকি?''

বলরাম বলল, ''পেটে খুব জোর আঘাত লাগলে অনেক সময় কিডনি ফিডনি ফেটে যায়, তাতে মানুষ বাঁচে না।''

বড়বাবু বলল, ''দেখা যাক আর কিছুক্ষণ। জ্ঞান ফিরলে ওকে জেরা করে জানা যেত, ও এখানে এল কী করে? আর যদি জ্ঞান না ফেরে, তা হলেও নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য রায়চৌধুরীর মাথায় গোটাচারেক গুলি চালিয়ে দিতে হবে!''

বলরাম বলল, ''তিলকরাম বোধহয় ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে। ও তো বুঝেছে, ওকে আজ শাস্তি পেতেই হবে। ওর ভুলের জন্যই তো এই গোলমালটা হল। এই ছেলেটার বদলে অন্য ছেলেটাকে গাড়িতে তুলে দিল।''

বড়বাবু বলল, ''তুমিই বা ভাল করে দেখে নিলে না কেন?''

বলরাম বলল, ''তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুটো ছেলেই একবয়সি, একইরকম চেহারা। মুখ বাঁধা ছিল বলে কথাও শুনিনি। তাই বুঝতে পারিনি। তার জন্য যদি আমায় কিছু শাস্তি দিতে চান, মাথা পেতে নেব।''

বড়বাবু বলল, ''সেটা পরে দেখা যাবে। কালিম্পং-এর ছেলেটার জন্য কত টাকা পাওয়া যেত, তা হাতছাড়া হয়ে গেল। এখন এই ছেলেটাকে নিয়ে কী করা যায়। ফেরত দেওয়াও তো শক্ত। পুলিশ সব জেনে গিয়েছে। এই বাচ্চাটাকে পেলে ওর মুখ থেকে আমাদের খোঁজ পেয়ে যেতে পারে।''

বলরাম বলল, ''এখন আর ফেরত দেওয়া যাবে না। ভেরি রিস্কি। ইট ইজ় বেটার টু কিল হিম।''

বিল্টু বলল, ''আই নো ইংলিশ। ইউ ওয়ান্ট টু কিল মি? ইঃ, অত সোজা নয়। কাকাবাবু তোমাদের এমন মারবেন।''

শিবু সর্দার বিল্টুর একটা কান ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, ''আরে যাঃ! তুমহার কাকাবাবু খতম হো চুকা!''

বিল্টু বলল, ''তুমি আমার কান ধরেছ কেন? আমিও তোমার কান ধরব।''

সে হাত তুলতেই শিবু খপ করে সেই হাতটা ধরে মুচড়ে দিল।

ব্যথা লাগলেও বিল্টু কাঁদল না। সে বলল, ''ইউ আর এ পাজি লোক। পাজি লোকরা হাত মুচড়ে দেয়।''

বড়বাবু বিরক্ত হয়ে বলল, ''অ্যাই, ছেলেটাকে ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়ে আয় না। এখন কাজের কথা হচ্ছে।''

শিবু বলল, ''ওকে খেতে দিয়েছি, কিছু খায়নি স্যার।''

বড়বাবু বলল, ''এ ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে এখন কিছুদিনের জন্য আমাদের গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। নো অ্যাক্টিভিটি। তারপর সব চাপা পড়ে গেলে আবার অ্যাকশন শুরু করব।''

বলরাম বলল, ''দেখুন, দেখুন স্যার, রায়চৌধুরীর হাতদুটো আগুনের মধ্যে পড়েছে, তবু লোকটা একটুও নড়ছে না!''

বড়বাবু বলল, ''এখনও জ্ঞান ফেরেনি?''

বলরাম বলল, ''আগুনের ছ্যাঁকা লাগলে তো অজ্ঞান লোকেরও জ্ঞান ফিরে আসে।''

বড়বাবু বলল, ''যদি খতম হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তো চুকেই গেল।''

সত্যিই কাকাবাবুর বাঁধা হাতদুটো পড়েছে আগুনের মাঝখানে। প্রথমে

দুটো হাতই কালো হয়ে গেল, তারপর পুড়তে লাগল চামড়া। পটপট করে শব্দ হতে লাগল। সকলেরই নাকে এল মড়া পোড়ার বিশ্রী গন্ধ।

বড়বাবু বলল, "মনে হচ্ছে সত্যিই মরেছে লোকটা। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওর নাকের কাছে হাত নিয়ে দ্যাখ তো বলরাম, নিশ্বাস পড়ছে কিনা। যদি এখনও নিশ্বাস পড়ে, তা হলে মাথার খুলিতে চারটে গুলি চালিয়ে দে।"

বলরাম উঠে এসে পা দিয়ে ঠেলে কাকাবাবুর দেহটা উলটে দিল। উপুড় থেকে চিত হয়ে গেল। এতদিনে একবারও কাঁদেনি বিল্টু। এইবার সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আর বলতে লাগল, "কাকাবাবু, কাকাবাবু!" তার ক্ষুদ্র হৃদয় বুঝেছে যে, কাকাবাবু আর আঁচে নেই।

বলরাম কাকাবাবুর শরীরটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে রাইফেলটা নামিয়ে রাখল। তারপর একটা আঙুল কাকাবাবুর নাকের কাছে নিয়ে একটুক্ষণ দেখে বলল, "নাঃ, নিশ্বাস পড়ছে না। শেষ!"

সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবু হাতদুটো দু'দিকে ছড়িয়ে উঠে বসলেন! আগুনে যেমন তাঁর হাত পুড়েছে, তেমন দড়ির বাঁধনটাও পুড়েছে! এখন খসে পড়ে গেল।

দারুণ ভয় পেয়ে গিয়ে বলরাম বলে উঠল, "এ কী? ভূ-ভূ-ভূত?"

কাকাবাবু বিকৃত গলায় বললেন, "হ্যাঁ, আমি ভূত হয়েছি। এবার তোদের সবক'টার সর্বনাশ করব।"

তিনি দু'হাতে বলরামের গলা টিপে ধরলেন। বলরামের অত বড় শক্তিশালী চেহারা, কিন্তু কাকাবাবুর হাতে যে এত জোর, তা সে কল্পনাই করতে পারেনি! একমাত্র ভূতের হাতেই এমন জোর থাকতে পারে। ছটফট করে সে নিজেকে ছাড়াতে পারল না। কাকাবাবু এক ঝটকায় তাকে পাশে ফেলে দিয়েই রাইফেলটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। শিবু সর্দার তার রাইফেলটা তুলে ঠিক করার আগেই কাকাবাবু তার দিকে দুটো গুলি চালিয়ে দিলেন। সে হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে উঠল। বড়বাবু কয়েক মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। তারপর সে বুঝে গেল, ভূত নয়, রায়চৌধুরী এখনও বেঁচেই আছেন, আর তাঁর হাতে রাইফেল!

সে ঝট করে বিল্টুকে তার বুকের কাছে টেনে এনে বলল, "রায়চৌধুরী, তোমার রাইফেলটা ফেলে দাও। তুমি আর কোনও চালাকি করতে গেলেই আমি এ ছেলেটার কানের মধ্যে দিয়ে গুলি চালাব। আমার হাতের রিভলভারটা দ্যাখো!"

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত কটমট করে তাকিয়ে রইলেন সেই বড়বাবুর দিকে।

জায়গাটায় যদি আলো থাকত, তা হলে কাকাবাবু ওই লোকটাকে হিপনোটাইজ় করতে পারতেন। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে তা সম্ভব নয়। কাকাবাবুর দু'হাত দিয়ে এখনও একটু একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কিন্তু মুখে একটুও ব্যথার চিহ্ন নেই। বরং রাগে গনগন করছে মুখ।

তিনি কর্কশ গলায় বললেন, ''তুমি ওই ছেলেটাকে গুলি করে মারবে? মারো দেখি! নিতান্ত গাধা না হলে তুমি তা করবে না। তারপর তুমি বাঁচবে কী করে? সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা পাগলা কুকুরের মতো তোমার শরীর ঝাঁঝরা করে দেব গুলি চালিয়ে!''

লোকটি একটু থমকে গেল। বিড়বিড় করে আপন মনে বলল, ''তুমি এত সহজে মরবে, এটা ভাবাই আমার ভুল হয়েছিল। তখনই যদি গুলি চালিয়ে দিতাম!''

কাকাবাবু বললেন, ''তখন গুলি চালাওনি, এখন তোমার প্রাণ আমার হাতে। যদি বাঁচতে চাও, ছেলেটাকে ছেড়ে দাও আর রিভলভারটা ফেলে দাও!''

লোকটি বলল, ''ছেলেটাকে ছেড়ে দিলেই তুমি আমাকে মারবে। তোমার কথায় কোনও বিশ্বাস নেই।''

কাকাবাবু বললেন, ''আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে প্রাণে মারব না! রাজা রায়চৌধুরীর কথার দাম আছে।''

লোকটি জিজ্ঞেস করল, ''তুমি আমাকে এখান থেকে ধরে নিয়ে যাবে?''

কাকাবাবু বললেন, ''না, তাও নিয়ে যাব না। সে অনেক ঝামেলা। আমি শুধু বিল্টুকে নিয়ে চলে যাব।''

লোকটি বলল, ''প্রমিস?''

কাকাবাবু বললেন, ''প্রমিস!''

লোকটি বিল্টুকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল।

কাকাবাবু বললেন, ''রিভলভারটা ফেলে দাও!''

সে সেটা ফেলে দিতেই কাকাবাবু সেটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরলেন। তারপর বিল্টুকে বললেন, ''বিল্টু, তুই উঠোনের বাইরে গিয়ে দাঁড়া তো।''

বিল্টু বলল, ''না, আমি তোমার সঙ্গে যাব।''

কাকাবাবু বললেন, ''যা বলছি, কথা শোন। বাইরে দাঁড়া। রান! ওয়ান, টু, থ্রি।''

বিল্টু দৌড়ে চলে গেল।

কাকাবাবু এবার লোকটিকে বললেন, ''তোমাকে প্রাণে মারব না কথা দিয়েছি, কিন্তু তোমাকে শাস্তি তো পেতেই হবে। ছোট ছেলেমেয়েদের চুরি করে নিয়ে তাদের প্রাণ নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে, তারা অমানুষ! তাদের ক্ষমা নেই।''

কাকাবাবু সেই বড়বাবুর দুই ঊরুতে দুটি গুলি চালিয়ে দিলেন। লোকটি আর্তনাদ করে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, ''পায়ে গুলি করলে কেউ মরে না। চিকিৎসা করালে সেরে উঠবে। বড়জোর খোঁড়া হয়ে থাকবে আমার মতো। আর এখন আমাকে তাড়াও করতে পারবে না।''

বলরাম এর মধ্যে অনেকটা সামলে উঠেছে। কাকাবাবু তার দিকে পিছন ফিরে রয়েছেন। সে একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে ছুড়ে মারল কাকাবাবুর দিকে। জ্বলন্ত কাঠটা কাকাবাবুর মাথায় লাগলে সাংঘাতিক কাণ্ড হতে পারত। কিন্তু সেটা লাগল কাকাবাবুর পিঠে!

তিনি অমনই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, ''তুমিই বা বাদ যাবে কেন!'' তারও দুই ঊরু ফুঁড়ে গেল দুই গুলিতে! কাকাবাবু গায়ের কোটটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে মাটিতে চাপড়ে আগুন নেভালেন। ওদের তিনজনের দু' পায়ে গুলি লেগেছে। উঠে দাঁড়াতে পারছে না। শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, ''থাকো এইভাবে। আমি তোমাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি।''

বিল্টু উঠোনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

কাকাবাবুর এক হাতে রাইফেল, অন্য হাতটা বিল্টুর কাঁধে রেখে বললেন, ''চল রে বিল্টু।''

বিল্টু বলল, ''তোমার হাত জ্বালা করছে না? কতটা পুড়েছে!''

কাকাবাবু বললেন, ''ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে!''

ভাঙা জায়গাটা পার হওয়ার পর সেই দুধওলাকে দেখা গেল, পাশে আর-একটা লোক।

কাকাবাবু তাদের ভয় দেখাবার জন্য শূন্যে একটা গুলি ছুড়লেন। অমনই দৌড় লাগাল তারা!

কাছেই রয়েছে একটা জিপ। কাকাবাবু বিল্টুকে নিয়ে সেই গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলেন। আধঘণ্টা পর রাস্তার ধারে একটা থানা দেখে থামলেন কাকাবাবু।

ভিতরে ঢুকে একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাছাকাছি কোনও ডাক্তারের চেম্বার কিংবা হাসপাতাল আছে? আমার হাতের চিকিৎসা করাতে হবে।"

কাকাবাবুর দু'হাতের কবজির অবস্থা দেখে শিউরে উঠে পুলিশটি বলল, "ওরেব্বাস, এই হাত নিয়ে আপনি গাড়ি চালালেন কী করে?"

কাকাবাবু যে এই হাতে রাইফেলও চালিয়েছেন, তা সে জানবে কী করে!

ডাক্তারের কথা জেনে নিয়ে কাকাবাবু পুলিশটিকে বললেন, "জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা বাড়িটায় যান। এখনই। সেখানে তিনজন ক্রিমিনালকে পাবেন!"

১২

গাড়ি চালাচ্ছে সিদ্ধার্থ। সামনের সিটে কাকাবাবু আর বিল্টু। পিছনের সিটে সন্তু আর জোজো আর রিনি। যাওয়া হচ্ছে এয়ারপোর্টের দিকে। কাকাবাবুর সঙ্গে বিল্টু আর রিনি যাবে দিল্লি। কাকাবাবুর বন্ধু নরেন্দ্র ভার্মার বাড়িতে থাকা হবে। কাকাবাবুর দু'হাতেই ব্যান্ডেজ।

জোজো বলল, "এবার বিল্টুই হিরো। আমি আর সন্তু কোনও চান্সই পেলাম না!"

কাকাবাবু বললেন, "বিল্টু আসল হিরো তো হবে আগামীকাল। দিল্লিতে। রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে ফার্স্ট প্রাইজ় নেবে।"

সিদ্ধার্থ বলল, "রিনি এত ভাল ছবি আঁকে, ও কোনও প্রাইজ়ই পেল না। আর বিল্টু ফার্স্ট প্রাইজ় পেয়ে গেল!"

রিনি বলল, "আমি ওকে শিখিয়েছি। ও পাওয়া মানেই তো আমারও পাওয়া।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, বিল্টুকে যেখানে আটকে রেখেছিল, সেই জায়গাটা কোথায়?

কাকাবাবু বললেন, "বিহারে। ছোট ছোট পাহাড় আর জঙ্গলের জায়গা।"

বিল্টু বলল, "আমাদের বাঘ দেখা হল না। কাকাবাবু, আমরা কিন্তু পরে বাঘ দেখতে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "যাব তো নিশ্চয়ই। তবে, বাঘ তো চোখ বুজলেই দেখা যায়, তাই না?"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, বিল্টু যে বলল, ওদের পালের গোদাটাকে অন্যরা বড়বাবু বলে ডাকছিল, ও কীসের বড়বাবু?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি!"

সন্তু বলল, "বোধহয় হেড অফিসের বড়বাবু!"

কাকাবাবু বললেন, "তা হতে পারে! ওর গোঁফ ছিল নাকি রে বিল্টু?"

বিল্টু খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "*হেড অফিসের বড়বাবু, লোকটি বড় শান্ত!* মোটেই শান্ত নয়, খুব পাজি!"

কাকাবাবু বললেন, "*তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনও জানত।*"

সন্তু বলল, "*দিব্যি ছিলেন খোশমেজাজে চেয়ারখানি চেপে।*"

বিল্টু বলল, "*একলা বসে ঝিমঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন খেপে।*"

কাকাবাবু বললেন, "*আঁতকে উঠে হাত-পা ছুঁড়ে চক্ষু করে গোল।*"

সন্তু বলল, "*হঠাৎ বলেন, গেলুম গেলুম আমায় ধরে তোল!*"

কাকাবাবু বললেন, "*তাই শুনে কেউ...* ইয়ে, তারপর কী যেন? অনেক দিন পড়িনি তো, মনে পড়ছে না। কী রে, সন্তু, তোর মনে আছে?"

সন্তু বলল, "বিল্টু সব জানে!"

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, "তুমি পারবে কিনা বলো।"

সন্তু বলল, "নাঃ, আমারও মনে নেই।"

বিল্টু গড়গড়িয়ে বলল, "*তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউ বা হাঁকে পুলিশ, কেউ বা বলে, "কামড়ে দেবে, সাবধানেতে তুলিস!"* আরও দু' লাইন বলে থেমে গিয়ে বিল্টু হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "তোমরা পারলে না তো! হেরে গেলে, আমার কাছে হেরে গেলে!"

সিদ্ধার্থ বলল, "এটাতেও বিল্টু ফার্স্ট!"

কাকাবাবু মনে মনে হাসলেন। তিনি ভাল করে জানেন যে, তাঁর সবটা মনে না থাকলেও সন্তুর পুরোটা মুখস্ত। সে ইচ্ছে করে বলল না। ছোটদের কাছে হেরে গিয়েও যে বড়দের কত আনন্দ হয়, তা ছোটরা জানতেও পারে না।

বিল্টু পকেট থেকে মাউথঅর্গান বের করে বাজাতে লাগল। আকাশ থেকে একটা প্লেন নামছে এয়ারপোর্টে।